মেলা

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

ইন্দ্রাণী প্রকাশনী

প্রযত্নে / নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ

৬৮, কলেজ স্ট্রীট

কলিকাতা—৭০০০৭৩

প্রথম সংস্করণ ঃ পৌষ ১৩৭১

প্রকাশিকা ঃ
মায়া চট্টোপাধ্যায়
ইন্দ্রাণী প্রকাশনী
নিউ বিবেকভিল,
ধাড়সা,

প্রচ্ছদ ঃ
বিদ্যা অশোক

মুদ্রক ঃ
শ্রীকমল মিত্র
নব মুদ্রণ
১ বি, রাজা লেন
কলিকাতা—৯

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্রবধূ
গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায় (বড় বৌদি)
মাতৃপ্রতিমাসু
—ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

॥ প্রস্তাবনা ॥

আমার যখন ২৩ বছর বয়স অর্থাৎ ১৯৬৪ সালে যখন আমি প্রথম জয়দেবের মেলায় যাই তখন এমন কিছু ঘটনার সঙ্গে আমি জড়িয়ে পড়ি যে সেটা একটা উপন্যাসের মতো হয়ে যায়। সে কাহিনী আমি তখনই লিখে ফেলি।

১৯৬৬ সালের জানুয়ারী মাসে এলোমেলো নামক একটি মাসিক পত্রিকায় লেখাটি প্রকাশিতও হয়। এই লেখা পড়ে অনেকেই তখন মুগ্ধ হন। কিন্তু বাংলা সাহিত্যে আমি তখন সম্পূর্ণ নবাগত। সেই আমার প্রথম উপন্যাস (প্রথম রচনা কামাখ্যা ভ্রমণ)। তাকে বই আকারে প্রকাশ করবে কে ? এর পর আরো দীর্ঘ ২৩ বছর কেটে যায়।

ঈশ্বরের ইচ্ছায় উপন্যাসটিকে এতদিনে বই আকারে প্রকাশ করতে পারলাম। এই বইয়ের কোন চরিত্রই কাল্পনিক নয়। সেই সব চরিত্রদের অনেকেই হয়তো এখনো বেঁচে আছেন। আবার অনেকেই যাত্রা করেছেন অমৃতলোকে। যারা বেঁচে আছেন তাদের কাউকেই ক্ষুণ্ন করার উদ্দেশ্য আমার নেই। ঘটনা আমাকে যখন যেভাবে যার কাছে নিয়ে গেছে বা যে কাজ করিয়েছে তারই বিবরণটুকু লিখেছি মাত্র। তবুও কেউ আহত হলে তাঁর কাছে আমার একটাই প্রার্থনা—

ক্ষমা করুন।

—লেখক

বীরভূম জেলার অন্তর্গত একটি বিখ্যাত গ্রাম কেঁদুলি। ভালো নাম কেন্দুবিল্ব। কিন্তু কেন্দুবিল্ব কেউ বলে না, কেঁদুলিই বলে। ছড়া কেটে বলে, পান খাবো দোক্তা খাবো যাবো কেঁদুলি, হুটুর হুটুর করছে ট্যাঁকে সিকি আধুলি। সেই কেঁদুলি কেন্দুবিল্বে উত্তরায়ণ সংক্রান্তিতে জয়দেব পদ্মার মেলা বসে। অজয় নদীর তীরে কদমখণ্ডীর ঘাটে কাটোয়া থেকে মা গঙ্গা ব্রাহ্ম মুহূর্তে কেঁদুলিতে আসেন। এ পর্যন্ত অজয় নদ এই দিন গঙ্গা মহিমায় মহিমান্বিত।

এই উপলক্ষ্যেই মেলা বসেছে।

বোলপুরে ট্রেন থেকে নামতেই দেখলাম সারি সারি মেলার বাস দাঁড়িয়ে আছে স্টেশন চত্বরে। বাসের কপালে লাল শালুর ওপর বড় বড় হরফে লেখা আছে জয়দেব কেঁদুলি বলে। বোলপুর থেকে পঁচিশ মাইল দূরে জয়দেব। বাসের ভাড়া মাথা পিছু দেড় টাকা। কিন্তু ভাড়া যাই নিক বাসে উঠতে পারলে তবে তো ভাড়া। বাসে যে তিল ধারণেরও জায়গা নেই। একেবারে ল্যাজা মুড়ো থুক থুক করছে। নিঃশ্বাস নেবার ফাঁক নেই। বাসের মাথায় যে উঠে বসব সে উপায়ও নেই। যত মালের কাঁড়ি সব ডাঁই করা।

এমন সময় হঠাৎ জয়দেব থেকে একটা খালি বাস ফিরে এসে সকল মুস্কিলের আসান করে দিল। সঙ্গে সঙ্গে জয়দেব যাত্রীরা ছেঁকে ধরল বাসটিকে। তারই মধ্যে কোন রকমে ঠেলে উঠে বসলাম দুজনে। আমি আর ন্যাড়া। ন্যাড়া আমার কেউ নয়। কিছুদিন আগে ভুবনেশ্বরে গিয়েছিলাম বেড়াতে। সেখান থেকেই আমার সঙ্গ নিয়েছে

ও। ভুবনেশ্বরে ওর নাকি যথা সর্বস্ব চুরি হয়ে যায়। তাই আমার সঙ্গে ছায়ার মতো রয়েছে। সত্য মিথ্যা জানি না, তাকে জিজ্ঞেস করলে সে তোতা পাখির মতো গড় গড় করে বলে যায়, মালদহ টাউনে তাদের মস্ত দালান। বিরাট বড়লোকের ছেলে সে, বাবা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন, এখন পরলোকে কি হয়েছেন তা সে জানে না। প্রচুর জমি জায়গা রয়েছে তাদের। আমের ব্যবসা রয়েছে। বাড়িতে চিঠি লিখেছে। সেখান থেকে টাকা এলেই সে চলে যাবে। বয়সও খুব বেশি নয়। কুড়ি থেকে পঁচিশের মধ্যে। মাথাতেও বেশ রীতিমতো ছিট আছে বলেই মনে হয়। মাথায় কদম ফুলের মতো গুঁড়ো গুঁড়ো চুল। গলায় কণ্ঠি। কপালে তিলক। ওঙ্কারনাথের কাছে দীক্ষা নিয়েছে। ছিটে ফোঁটা মালা ঝুলি সবই আছে তার।

যাইহোক। আমাদের সঙ্গে মালপত্তর বিশেষ কিছু ছিল না। যা ছিল তা হাতের কাছেই রাখলাম। দেখতে দেখতে চোখের পলকে ভর্তি হয়ে গেল বাস। গাঁয়ের বিধবা বুড়ি আর বাউল বৈরাগীতে চিড়ে চ্যাপ্টা হবার যোগাড় হ'ল। যে কজন পারল সিটে বসল। বাদ বাকি নীচে।

আমার পাশে বসেছিলেন এক বাবাজী, তাঁর হাতের একতারাটি কোন এক ভাত্তুর মায়ের কপালে লাগল। ভাত্তুর মা তো মুখিয়ে উঠলেন—ওহে বাবাজী! তোমার এই ঢেঁকিটাকে সামলাও দেখি, একে মরছি ভিড়ের ঠ্যালায়, তার ওপরে তুমি যদি একমুখ দাড়ি নিয়ে বুড়ো মিনসে কপালে ঠকাস ঠকাস করো তাহলে কিন্তু ভালো হবে না বলে দিচ্ছি।

ওপাশে তখন আর একজন কে চেঁচিয়ে উঠেছে—মুখে জুত্‌তো মারবো তুর। মেইয়ে মানুষের গায়ে হাত্ত দিতে ভারি মজা লাগে না? মুখপোড়া। কণ্ডাক্টর হুনছিস বল্যে কি মাথাটা কিন্যে লিছিস্? ঘরকে মা বুন লাই তুর?

ছোকরা কণ্ডাক্টরের মাথা তখন গরম হয়ে গেছে। সে তেড়ে উঠে বলল—কি! আপনি আমার মা বোন তোলালেন? নেমে আসুন বলছি আমার বাস থেকে। নেমে আসুন। আপনাকে আমি নিয়ে যাবো না।

—তুর বাবার বাস যে নিয়ে যাব্বি না ?

—আমার বাবার বাসই হোক, যারই হোক। আপনাকে আমি নামতে বলছি, নামুন।

—না। নামব না।

—মেলায় তো অনেক বাস আছে। যান আপনি সেই বাসে।

আমি বললাম—কেন তর্ক করছ ভাই ? কথাতেই কথা বাড়ে। তার চেয়ে দয়া করে বাসটা একটু ছাড়বার ব্যবস্থা করো।

কণ্ডাক্টার একটু শান্ত হ'ল এবার। তারপর ধীর গলায় বলল—এই যে দাদা ছাড়ছি। আর একটু বসুন। দেখুন না, নিজেই উঠল গায়ে ধাক্কা দিয়ে, তা আমি একটু হাত ধরে ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়েছিলুম, অমনি লেগে গেল আমার সঙ্গে। নিজের বেলায় দোষ হ'ল না, যত দোষ আমার বেলায় ?

দোষ যদিও মহিলাটির তবুও আমি তার হয়েই কণ্ডাক্টারকে চোখ টিপে বললাম—যাকগে যাক। চুপ করো। কি হবে মেয়েছেলের সঙ্গে ঝগড়া করে ? হাতটা না ধরলেই পারতে।

এমন সময় স্টার্ট দিল বাসে।

আমার পাশে যে বাবাজী বসেছিলেন তিনি অমনি লাফিয়ে উঠলেন—রোসো রোসো। ও কণ্ডাক্টার! একটু দাঁড়াও বাবা। আমার লোক রয়েছে বাইরে।

ভাত্বর মা বললেন—ভ্যালা আপদরে বাবা। একে মরছি ভিড়ের ঠ্যালায়, তার ওপর ধিকিয়ে ধিকিয়ে যদিও বা ছাড়ল বাসটা তা বলে কিনা লোক রয়েছে বাইরে। বলি হ্যাঁগা, তোমার এই একটা লোকের জন্যে এতগুলো লোক বসে বসে কর্মভোগ করবে নাকি ?

—একটা লোক কি গো মা, পাঁচ পাঁচজন লোক রয়েছে আমার।

কণ্ডাক্টার বোধ হয় আরো পাঁচজন লোকের লোভ সামলাতে পারল না। অমনি ঠিন ঠিন করে ঘন্টি বাজিয়ে বাস থামাতে নির্দেশ দিল।

ড্রাইভার বিরক্ত হয়ে বলল—কি হ'ল আবার ?

—লোক আছে।

আমার মাথায় যেন আগুন জ্বলে উঠল। বললাম—লোক যে আছে তা লোককে তুলবে কোথায় ? এখানে তো পা রাখবারও জায়গা নেই।

—ওরই মধ্যে করে নিতে হবে।

ড্রাইভার বলল—আমি ওসব জানি না। বলে বাস ছেড়ে দিল।

বাবাজী হাঁ হাঁ করে উঠলেন।

আমি বললাম—আপনি বরং নেমে যান।

—সেই ভালো বাবা। নেমে যাওয়াই ভালো। বলি ওহে ও কণ্ডাক্টার, বাসটা একবার থামাও না বাবা।

কণ্ডাক্টারকে আর বাস থামাতে হ'ল না। বাস আপনিই থেমে গেল। স্টেশন বাজারের বাঁদিকে যে গলিতে ঢুকেছিল বাস সেখানে একটা গাড্ডায় পড়ে থেমে গেল সমস্ত ঘর্ ঘরানি।

সেই সুযোগই বাবাজীর সুযোগ।

—দেখি গো মায়েরা একটু রাস্তা।

কিন্তু রাস্তা কোথায়? একটা পিঁপড়েরও যেখানে চলবার উপায় নেই সেখানে অমন একজন দামড়া বাবাজীর রাস্তা হওয়া কি করে সম্ভব? সকলের মধ্যে তখন গুঞ্জন উঠল।

—আ মর। নামবি তো ওঠা ক্যানে?

—বুড়ো মিনসে ঢঙ।

—মলো যা। ঘাড়ের ওপর পা দেয় দেখো।

বাবাজী তখন কোন রকমে খাড়া হয়েছেন। এবং সেই ফাঁকেই তাঁর জায়গাটিতে দু'দুজন বসে পড়েছে। তাদেরই ভেতর থেকে একজন ফুট কাটল—জয় রাধে।

ঐ অবস্থাতেও বাবাজী বিনয়ে গলে পড়লেন—আহা-হা! বেশ নামটি করেছ ভায়া। জয় রাধে! জয় রাধে।

ভাদুর মা একটু হেঁট হলে বাবাজী তার মাথার ওপর দিয়ে ডিঙিয়ে এর ঘাড়ে ওর মাথায় পা ছুঁইয়ে কোন রকমে গলদঘর্ম হয়ে নেমে গেলেন।

এমন পৌষের শীতেও গায়ে তখন ঘাম দিচ্ছে।

আমার পাশে যে স্ত্রীলোকটি বসেছিলেন তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন—তুমি কোথায় যাচ্ছো বাবা?

—জয়দেব যাবো।

—একাই না সঙ্গে কেউ আছে?

পাশে বসে থাকা তিলকধারি ন্যাড়াটাকে দেখিয়ে দিলাম। তার দিকে একবার নজর বুলিয়ে তিনি আবার বললেন—ওটি কে? চাকর বুঝি?

ন্যাড়ার কান দুটি তখন লাল হয়ে উঠেছে।

আমি বললাম—না চাকর নয়। ভাই।

—ও মা! কিন্তু ভাই বলে তো মনে হচ্ছে না বাবা?

—নিজের ভাই নয়। ভাইয়ের মতো।

—তাই বলো। তোমার ভাই কখনো ও রকম দেখতে হয়?

—আপনি কোথায় যাচ্ছেন?

—আমিও জয়দেবেই যাবো। ফি বছর যাই। এ বছর যাবো না যাবো না করেও বেরিয়ে পড়লুম।

—বেশ করেছেন। কোথায় বাড়ি আপনার?

—কাছেই। গুসকরায় নেমে মাইল দুয়েক যেতে হয়। তা তোমার নাম কি বাবা?

নাম বললাম।

—ও। বামুনের ছেলে তাহলে? আমরাও বামুন।

হঠাৎ একবার গোঁ গোঁ করে উঠল বাসটা। তারপর থেমে গেল। কণ্ডাক্টার টিকিট চাইলে বললাম—বাস চলুক আগে, তারপর টিকিট। তোমার বাসের যা অবস্থা দেখছি তাতে তো মনে হচ্ছে না এ বাসে যেতে পারব বলে।

কণ্ডাক্টার বলল—আজ্ঞে না, সে ভয় নেই। মিস্ত্রি লেগে গেছে। ঠিক হয়ে এলো বলে।

অগত্যা টিকিট করতেই হ'ল। করতে যখন হবেই তখন মিছিমিছি দেরি করেই বা লাভ কি? বাস খারাপ হয় পয়সা ফিরিয়ে নিলেই হবে। এখন তো টিকিট করা হোক।

এদিকে বুড়িগুলোকে নিয়ে হয়েছে যত জ্বালা। তারা কিছুতেই

পুরো ভাড়া দেবে না। কণ্ডাক্টারের হাতে পায়ে ধরতে লাগল—হ্যাঁ বাবা, ভাড়া এত বেশি কেন ? প্রত্যেকবার আমরা এক টাকায় যাই, এবারে দেড় টাকা কেন ?

কণ্ডাক্টার বলল—দেড় টাকা ভাড়া বরাবরই। শুধু এ বছর নয়। মেলার সময় প্রত্যেক বছরই দেড় টাকা করে ভাড়া হয়।

—কিন্তু আমরা যে গত বছরেও গেছি।

—আপনারা গেছেন বললেই তো হবে না। আমরা নিয়ে গেছি। কাজেই গত বছরে ভাড়া এক টাকা ছিল কি দেড় টাকা ছিল তা আমাদের মনে আছে।

একজন বলল—চার আনা পয়সা কম করো না মানিক।

—এক পয়সাও কম করব না। আপনার পোষায় চলুন, না পোষায় নেমে যান।

—দু'আনা কম করো তবে।

—বলছি তো কম হবে না। বিরক্তিতে তেতে ওঠে কণ্ডাক্টার।

অগত্যা দেড় টাকা দিয়েই টিকিট কাটতে হয় বুড়িদের। মনে মনে অসন্তুষ্ট হয়। এক আধটা পয়সা তো নয়। দেড় দেড়টি টাকা।

আর একজন বলল—এই ছেলের টিকিট লাগবে বাবা ?

—লাগবে।

—কেন লাগবে কেন ? ট্রেনে লাগল না বাসে লাগবে ?

—হ্যাঁ। রেলের বাবুরা তোমার কুটুম বাড়ির লোক হয় তাই লাগেনি। এখানে লাগবে। বুড়ো হয়ে মরতে চলল এখনো মিথ্যে কথা বলা ঘুচল না।

বুড়ি অমনি গালে হাত দিয়ে শিউরে উঠল—ও মা! ঐ বেচুর মাকে জিজ্ঞেস করো ট্রেনে ওর টিকিট লেগেছিল কি না।

বেচুর মা বলল—না বাবা, মিথ্যে কথা বলব না টেরেনে হাফ টিকিট লেগেছিল।

—হ্যাঁ, ট্রেনে হাফ টিকিট লেগেছিল, বাসে ফুল টিকিট লাগবে।

—কেন, ফুল টিকিট কেন ? এইটুকু ছেলের ফুল টিকিট ? ট্রেনে ফুল টিকিট নিল না, বাসে ফুল টিকিট ?

—এই তো নিয়ম। আমাদের পিছনের বাসে আসুন, একদম

ভাড়াই নেবে না। পরের বাসে এলে আরামে আসবেন। এখন জায়গাটা খালি করুন দেখি দয়া করে ? মেলার সময় চালাকি নয়।

অগত্যা ফুল টিকিটই করতে হ'ল বুড়িকে।

আর একজন বলল—তুই আমার শিবুর মতন। লক্ষ্মী ধন আমার। মাত্তর একটি টাকা আছে বাবা আমার কাছে। এটা নিস না, আমাকে ছেড়ে দে।

কণ্ডাক্টারের ধৈর্যের তখন বাঁধ ভেঙে গেছে। বলল—আমি কারো মতোই হতে চাই না। দয়া করে আঁচলের গিঁট খুলে পুরো ভাড়াটি বের করুন। নাতো নেমে যান। ওসব খাতির চলবে না এখানে। বাস আমার বাবার নয় যে ইচ্ছে মতো ভাড়া নেবো।

বাসটা আবার গেঙিয়ে উঠল। মনে করলাম গেঙিয়ে উঠে এবারও থেমে যাবে বুঝি। কিন্তু না, এবার আর থামল না। এবার সত্যি সত্যিই চলতে শুরু করল।

কন কনে ঠাণ্ডা বাতাস হু হু করে ঢুকল বাসের মধ্যে। সেই সঙ্গে যত রাজ্যের ধুলো।

ধুলোর রাজ্য শেষ হলে পৌষের ধান কাটা মাঠ, রাঙা বরণ মাটি আর হলুদ রোদের ছটা দেখে চোখ ধন্য হ'ল। বাতাসে মাটির গন্ধ পেয়ে ভরে উঠল মন। ন্যাড়াকে বললাম—কিরে, কেমন লাগছে ?;

ন্যাড়া সংক্ষেপে জবাব দিল—ভাল্‌লো।

বসে এগিয়ে চলল।

আমার পাশে যে স্ত্রীলোকটি বসেছিলেন তিনি বললেন—আমার একটি মেয়ে আছে। পয়সা কড়ির অভাবে বে দিতে পারছি না। তোমার জানা শোনা তেমন কোন ভালো পাত্র যদি থাকে তো বোল না বাবা।

তাঁর কথা শুনে খুব হাসি পেল আমার। বাসের আলাপ। একটু পরেই কে কোথায় মিশে যাবো তার ঠিক নেই! ভালো পাত্রের সন্ধান পেলেই বা জানাবো কাকে ? বললাম—ও সব খোঁজ খবর আমি রাখি না মা।

স্ত্রীলোকটি চুপ করলেন। একটু পরে আবার বললেন—মেয়েটাকে ঘরে রেখে এসেছি। মনটার সুখ নেই। সোমত্ত মেয়ে।

বললাম—দেখাশোনা করবার কেউ নেই বুঝি ?

—তা অবশ্য আছে। আমারই বোনের কাছে রেখে এসেছি। ঘরে মেয়ে রেখে কোথাও বেরোতে সাহস পাই না। আবার না বেরিয়েও পারি না।

—সঙ্গে নিয়ে এলেন না কেন, ল্যাঠা চুকে যেত তাহলে।

—দুর্গা দুর্গা। এই মেলায় আবার মেয়ে নিয়ে আসে ?

—কেন, মেয়েরা আসে না মেলা দেখতে ?

—আসবে না কেন, যারা আসে তারা আসে। তবে একেবারে নেহাৎ যদি কাছে পিঠে ঘর হোত তাহলে ভাবনা ছিল না। কোথায় মাঠে ঘাটে পড়ে থাকব তার নেই ঠিক। সোমত্ত মেয়ে নিয়ে সে কি সম্ভব ?

—তা অবশ্য নয়।

একটা খড় বোঝাই গরুর গাড়িকে পাশ কাটাতে গিয়ে বাসটা একবার উল্টে যেতে যেতে রয়ে গেল। বিশ্রীভাবে একটা অকথ্য গালি দিয়ে টালটা সামলে নিয়ে আবার আগের মতো চালাতে লাগল ড্রাইভার।

স্ত্রীলোকটি আবার বললেন—তুমি চাকরি বাকরি করো তো বাবা ?

আমি হেসে বললাম—না, ভবঘুরে। ঘুরে ঘুরে বেড়াই।

—তাহলে তোমার বাড়ির অবস্থা ভালো নিশ্চয়ই ?

—মোটামুটি।

—তবে তুমি ঘুরে বেড়াবার পয়সা পাও কোথায় ?

বড়ই কঠিন প্রশ্ন। সত্যিকথা বলতে কি আমি নিজেই জানি না ঘুরে বেড়াবার রসদ আমার পকেটে কি করে এসে যায়। আমার ভাগ্য যে আমাকে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ায় এই কথাটা আমি কাউকে বোঝাতে পারি না। বললাম—দেখুন, এর উত্তর আমার পক্ষে দেওয়া অসম্ভব।

—বাবা মা আছে ?

—হ্যাঁ।

—আর কে আছে ?

—বড় দিদি আছেন। বিয়ে হয়ে গেছে তাঁর। আমার পরে একটি ভাইও আছে।

—এখন তুমিই তাহলে বড় ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—তা বাবা, বাড়ির বড় ছেলে তুমি। তুমি এভাবে ঘুরে বেড়াও কেন ? বিয়ে থা করেছ ?

আমার এবার সত্যিই হাসি পেল। বললাম—শুনছেন আমি ভবঘুরে ছেলে। বিয়ে করে বউকে খাওয়াবো কি ?

আমাদের কথাবার্তা আর একজন শুনছিলেন কান খাড়া করে। তাঁকে হস্তিনী বলব না পর্বতীনি বলব তা ভেবে পাচ্ছি না। তিনি সধবা। কপালে সিঁথিতে ডগ ডগ করছে সিঁদুর। হাতে নোয়া, শাঁখা। সোনার চুড়ি। বললেন—তা দোষ তো বাপু তোমার বাপ মায়ের। জোর করে একটা ঝুলিয়ে দেয়নি কেন গলায় ? তারপর দেখতুম কিরকম ভবঘুরে ছেলে তুমি।

তাঁর পাশের জন বললেন—চাকরি বাকরি নেই। এর ওপর বে করেই বা করবে কি বল ?

—তুই থাম নিশি। চাকরি নেই। কত দেখলুম। বিয়ে করলে বউয়ের পয়ে চাকরি আপ্‌সে এসে জুটে যাবে। বুঝলি ? কি নাম বাবা তোমার ?

নাম বললাম।

—তাহলে তো বামুনের ছেলে। দেশ কোথায় ?

—বর্ধমান। সদরঘাটে নদী পেরিয়ে রায়নার দিকে আমার দেশ। গ্রামের নাম নাড়ুগ্রাম।

—তা হ্যাঁ বাবা, যদি বে করো তো বলো না। আমার একটি বোনঝি আছে। দেখতে শুনতে খুব ভালো। করবে ?

বললাম—মিছিমিছি একটা মেয়ের জীবন নষ্ট করে আপনাকে অভিসম্পাতের ভাগী করব কেন বলুন ? আপনার সঙ্গে তো আমার কোন শত্রুতা নেই।

বাস তখন ঘন এক শালবনের ভেতর দিয়ে চলেছে, সবাই বলল—

ইলামবাজারের শালবন, খুব ঠাসাঠাসি করে বসে থাকার দরুণ শাল-বনের সৌন্দর্যটা ভালোভাবে উপভোগ করতে পারলাম না। অবশ্য এর জন্য কোন অতৃপ্তি রইল না আমার। কেননা এর আগে আমি অনেক জায়গায় শালবন দেখেছি। উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে কুমারীকা পর্যন্ত দৌড় আমার। শালবন পার হয়ে বাস ইলামবাজারে থামল।

যে মহিলাটি বাসে উঠে গায়ে হাত দেওয়ার ব্যাপার নিয়ে কণ্ডাক্টারের সঙ্গে ঝগড়া করছিল তাকে এখানে নেমে যেতে দেখা গেল।

জয়দেব এখনো অনেক দূর। কোন্ ভোরে বেরিয়েছি ঘর থেকে, এখনো পেটে কিছু পড়ে নি। পেটের ভেতর চুঁই চুঁই করছে এবার।

—তা বাবা, তেমন ভালো ছেলে টেলে নেই তোমার সন্ধানে? প্রশ্ন করলেন সেই তিনি। যিনি গুসকরায় তাঁর বোনের কাছে গচ্ছিত রেখে এসেছেন মেয়েকে। একবার মনে হ'ল বলি, আমায় কি ঘটক পেয়েছেন? বললাম তো তখন আমার সন্ধানে ওসব নেই। কিন্তু মনে এলেও মুখে এলো না কথাটা। বড় দুঃখ হল তাঁকে দেখে। একজন নিঃস্ব বিধবার কাছে কন্যাদায় যে কতখানি তা আমি এনাকে দেখেই বুঝে নিলাম।

তিনি আবার বললেন—এই তোমার মতো দেখতে শুনতে।

আমার হাসি পেল। বুঝলাম আসলে আমাকেই ওনার পছন্দ। কিন্তু সে কথা স্পষ্ট করে তিনি বলতে পারছেন না। বললাম—সে রকম ছেলে তো আমার সন্ধানে নেই। থাকলে জানাতাম।

—আমার মেয়েকে কিন্তু ভারী চমৎকার দেখতে। মা হয়ে মেয়ের রূপের প্রশংসা করলে একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যায় বটে তবুও আমার মেয়েকে দেখলে বলতে সত্যি বলছি কি মিথ্যে বলছি।

বেলা যত বাড়ছে বাসও তত ছুটছে। শীতের দুপুর। সোনা ঝরা রোদ্দুর আর আদিগন্ত ধানকাটা মাঠ আমার চোখে স্বপ্ন এনে দিল। নিজের মনে কত কথাই ভাবতে লাগলাম। ভাবতে ভাবতে মেলা তলায় পৌঁছে গেলাম একসময়। আমার মন ভরে

উঠল আনন্দে। এই তো সেই কেঁদুলি। জয়দেব কেঁদুলি, শ্রীপাট কেন্দুবিল্ব। শ্রীমন জয়দেব গোস্বামীর লীলাভূমি, এই পুণ্য তীর্থে অজয়ের তীরে বসে ভক্ত কবি রচনা করে ছিলেন গীত গোবিন্দের মধুর শ্লোক। তার অসম্পূর্ণ পদকে পূরণ করতে স্বয়ং ভগবানকেও একদিন আবির্ভূত হতে হয়েছিল এইখানে। এই সেই স্থান, রাঢ়ের সেই বিখ্যাত দেশ। ভক্ত লোক আজও নাকি এই অজয়ের তীরে কদম-খণ্ডীর ঘাটে প্রভুর বংশী ধ্বনি শুনতে পায়। মকরযোগে আজও তাই হাজার হাজার পুণ্যার্থী ছুটে আসে এখানে।

অনেকখানি জায়গা জুড়ে বসেছে মেলাটা। যেদিকে দুচোখ যায় শুধু মানুষ আর মানুষ। যেন এক মহাপ্লাবনে ভেসে ভেসে সব এসে জড় হয়েছে এক জায়গায়। কত দেশ দেশান্তর থেকে এসেছে তারা। আসপাশের গ্রামাঞ্চল থেকেও এসেছে কত। দলে দলে হাজারে হাজারে জড় হয়ে মেলায় মিলেছে। এই মেলা মহামিলনের মেলা। মেলায় মিলে মেলার আনন্দের মাঝে সকল আনন্দের সার সেই পরম ঈশ্বরকে অনুভব করবে বলে এসেছে।

যারা এসে মিলেছে তাদের অধিকাংশই বাউল, বৈরাগী, সাধু, সন্ত, ভিখারী ও বৈষ্ণবের দল। ফাঁকা মাঠে গাছতলায় সংসার পেতেছে তারা। স্থানে স্থানে মাটির চাঙাড়ে, নয়তো ইঁট পেতে মাটির হাঁড়িতে অথবা মালসায় কাঠের জ্বালে ভাত তরকারি রান্না করছে। এই খেয়েই এই উন্মুক্ত উদার আকাশের নিচে এরা রাত কাটাবে।

এরই মধ্যে যারা একটু পদস্থ, মানে যারা ভবঘুরে নয়, ঘর আছে, সংসার আছে অথচ মেলায় এসেছে পুণ্যার্জনে তারা মাথা পিছু একটাকা করে ঘর ভাড়া নিয়ে খোঁয়াড়ে বন্দী ভেড়ার পালের মতো আশ্রয় নিয়েছে কোথাও।

এখানে চারিদিকেই শুধু কোলাহল আর কোলাহল। হৈ হৈ ব্যাপার আর রৈ রৈ কাণ্ড। নামের গুণগান চারিদিকে। টুং টাং একতারার তান আর আনন্দ লহরীর লহরাব মাঝে মেলার কোলাহলকে ছাপিয়ে ওঠে বাউলের উদাত্ত গলার গান—

চল ভাই চল আনন্দমেলায়
পাগলের আনন্দমেলা পাগল চাঁদের খেলা
দেখবি যদি নাই বিবাদি
এই বেলা কর খেলারে— ।

খেলাই বটে। পাগলের আনন্দমেলায় পাগলদেরই লীলাখেলা। মহামানুষের মিলন ক্ষেত্রে মানুষ অমানুষের খেলা। মেলা আর খেলা! খেলা আর মেলা। মেলা আর মানুষ। মানুষ আর দোকান। সারি সারি দোকান। গাছতলায় বাঁশের খুঁটি গেড়ে তার ওপর কঞ্চির তক্তা পেতে তেলেভাজা বেগুনির দোকান বসেছে। পোড়া তেলের গন্ধ উঠছে ভর ভর করে।

ধানকাটা মাঠে ভালো মন্দ খেয়ো ভুয়ো নানা রকম কাঠের দরজা, জানালা, তক্তাপোষ, খাট, আলমারী নিয়ে বসে আছে ছুতোরের দল। অনবরত ঘসর ঘসর শব্দ উঠছে তাদের করাতে। র‍্যাঁদা ঘষছে হোঁস হোঁস করে। পলওলা বাটালির মাথায় হাতুড়ির ঘা পড়ছে ঠক ঠক ঠক। তুরপুন নিপ্তেন আর এড়ো খুরসুতের কাজ চলেছে সমানে। তার পাশেই বসেছে যারা অনেকেই তারা গয়া জেলার লোক। তারা এনেছে পাথরের সামগ্রী। থালা গেলাস ঘটি বাটি নোড়া শিল সব এনেছে। কেউ কেউ এনেছে পাথরের কারুকার্য করা অজন্তা ইলোরা বা কোনারকের সূর্যমন্দিরের নর্তকীদের অনুকরণে নানা রকমের মডেল।

আর বসেছে সারি সারি খাবারের দোকান। রাজভোগ মোহন ভোগ, রসগোল্লা, পানতুয়া থেকে মায় চার পয়সা দামের খাজাও চার আনায় বিকিয়ে যাচ্ছে। দোকানিরা অনবরত চেঁচাচ্ছে—এই যে বাবু আসুন। খাবার খেয়ে যান। জয়দেবের মেলায় মিষ্টিমুখ করুন। আসুন।

তারপর চায়ের রাজত্ব। পাঁপড় তেলেভাজার গন্ধ শোঁকো আর চা খাও। দশ পয়সার কমে কোন জিনিসটি পাবে না। না পাঁপড়ভাজা, না আলুর চপ, না এক ভাঁড় চা। তবে আর কিছু হোক বা না হোক চা'টা তো খেতেই হবে। কারণ এটা হ'ল নেশার জিনিস। ন্যাড়াকে নিয়ে আমি তাই ঢুকে পড়লাম একটা দোকানে। তারপর দুজনে

চোখ বুজে দু' ভাঁড় চা খেয়ে কুড়িটা পয়সা দোকানদারকে দণ্ড দিয়ে ভিড় ঠেলে আবার এগোতে লাগলাম।

কদমখণ্ডীর ঘাটের পাশে কাঙাল ক্ষ্যাপার সমাধি মন্দির। আর সমাধি মন্দিরের পাশেই বড় বড় বট অশ্বত্থে ঘেরা এক বিস্তীর্ণ জায়গা দখল করে বসে আছে যত সব তান্ত্রিকের দল। রক্তবস্ত্র রুদ্রাক্ষ আর গনগনে ধুনির আগুনে জমজম করছে জায়গাটা। তাদের পিছনেই বসেছে বাউল সম্প্রদায়। সাদা কালো লাল হলদে আলখাল্লা প'রে পায়ে ঘুঙুর বেঁধে বাউলরা বসে বসে এক তারার তারে টুং টাং করছে। কেউ বা খুব মোলায়েম করে আস্তে আস্তে সুর দিচ্ছে—

মনরে আমার চিনলিনা পরম তত্ত্ব বিষয় মত্ত
সদাই করো ভাবনা।

বাউলের পাশেই বৈরাগী। রাধিকাজীর দল। তারপর বৈষ্ণব বৈষ্ণবী, সধবা বিধবা, নবীনা প্রবীণা। যুবক বৃদ্ধ কত আছে। কত রূপের ছড়া ছড়ি সেখানে। যৌবনের সমারোহ। দেখে চোখ জুড়োয়। মন ভরে যায়। টক টক করছে গায়ের রঙ। অঙ্গ ভরা রূপ। কাঁচা বয়স। যৌবনে উপচে পড়ছে। সত্ত বিধবা হয়তো। কপালে তিলক। গলায় কণ্ঠি। সাদা থান প'রে গাছ তলায় পড়ে আছে। সাহসে বাঁধা বুক তার। ভয় নেই। ডর নেই।

ন্যাড়া কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলল—বেশ কচ্চি কচ্চি লাগছে বটে।

আমি হেসে বললাম—তাই নাকি রে, বিয়ে করবি ?

—তুমি করো ক্যান্নে। আমার দরকার নাই। কালো কয়লা আমি। আগুন নিয়ে কি পুড়ে মরব ? এই 'মরব' কথাটা ন্যাড়া বলে বেশ। সব কথার শেষেই ও একটা বিচিত্র ধরণের টান দেয়। মরব উচ্চারণ করে 'মরবোঅ'। কখনও বা শুধুই মর'ব'।

ন্যাড়ার কথার উত্তরে বললাম—কালো হলেই কয়লা হয় নাকি ? তুই ব্যাটা তো লোহা।

—আহা! কি ঢঙের কথাই শুনাইলে গ। লোহাই হই আর যাই হই। আমার দরকার নাই। তুমার দরকার থাক্যে তো বলো, রাজি হয় কি দেখি।

—থাক। আর দেখতে হবে না। এখন পেট যে জ্বলছে, কি করি বল তো?

—পেট জ্বলছে, এবার খেয়ে নিলেই হয়। চান করবা?

কথায় কথায় নদীর ঘাটেই এসে পড়েছিলাম। কত লোক স্নান করছিল তখন নদীতে। বললাম—এই শীতে অবেলায় চান করে দরকার নেই। কাল যোগে চান করব।

—তবে হাত মুখ ধুয়ে নাও।

—সেই ভালো।

হাত মুখ ধোবার জন্য নদীর জলে নামতেই মনে হ'ল পায়ের ওপর কেউ যেন বেপরোয়া একটা ছুরি চালিয়ে দিল। অজয়ের জল এত ঠাণ্ডা যে বরফগলা জলের মতো মনে হ'ল। জল খুব বেশী নয়। কোথাও হাঁটু জল, কোথাও চেটো ডোবে না। সেই জল পেরিয়ে বালির চরায় উঠলাম দুজনে। ধূ ধূ করছে মরুভূমির মতো সুদূর প্রসারি বালির চর। নদী এখানে চওড়া খুব। জল কিন্তু এ কূল ঘেঁষে একফালি। বাকিটা শুধুই বালি।

অজয়ের জলে বেশ করে হাত মুখ ধুয়ে খাবার ভাগ করতে বসলাম। লুচি তরকারি সঙ্গেই ছিল। আলাদা আলাদা দুটো ভাগ করলাম।

ন্যাড়া বসল মালা জপতে। জপতপ না করে ও কিছু মুখে দেয় না। ওর মধ্যে ভক্তি কতটুকু আছে তা জানি না। তবে ভণ্ডামোটা যে পুরোমাত্রায় আছে তা অনুভব করতে পারি।

আমি অবশ্য ওর অপেক্ষা না করেই খেতে শুরু করে দিয়েছিলাম। কেননা ক্ষিদেয় পেট তখন এমনভাবে জ্বলছিল যে একটু অপেক্ষা করবার মতো ধৈর্যও আর অবশিষ্ট ছিল না। আনন্দে আমি খাচ্ছিলাম। এইভাবে নদীর গর্ভে বসে শীতের রোদ্দুর গায়ে মেখে দুপুরের খাওয়া খেতে আমার কি ভাল যে লাগছিল তা বলে বোঝাতে পারব না।

হঠাৎ দুটো জাঁদরেল কুকুর এসে খাওয়ার শান্তিটুকু কেড়ে নিল। ঘাটের মড়াখেকো কুকুর। ইয়া গব্দর চেহারা। দুজনে দু'পাশ থেকে

ভাঁটার মতো বড় বড় চোখ বার করে এক পা এক পা এগিয়ে আসতে লাগল আমার দিকে। গোঁ গোঁ করে গর্জাতে লাগল। ভাবটা এই, হয় মুখের গ্রাসটি ছুঁড়ে দাও, নয় তো আঁচড়ে কামড়ে ছিঁড়ে খাব। মহা মুস্কিল। দু'একবার হুট্ হ্যাট করলাম। কিন্তু হাঁক ডাক মানবার কুকুর এরা নয়। একবার মনে হ'ল পায়ের জুতোটা ছুঁড়ে মেরে দিই। আবার মনে হ'ল থাক। বলা যায় না, হিতে বিপরীত হতে পারে। এখানে লোকজনও বিশেষ নেই। তাই ব্যাটাদের স্পর্ধা বেড়ে গেছে। অগত্যা কোন রকমে আধ চিবুনো করে গিলে তবে রেহাই পাই। ন্যাড়া তার খাবার নিয়ে নদীর জলে দাঁড়িয়ে খেতে লাগল। আমিও নদীর জলে নেমে আঁজলা ভরে জল পান করলাম। প্রাণটা যেন জুড়িয়ে গেল। গলা থেকে পেট পর্যন্ত শরীরের ভেতরটা কন কনিয়ে উঠল। জল খেয়ে বালির চরায় সতরঞ্চি বিছিয়ে সটান শুয়ে পড়লাম। শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলাম কত কি। ওপরে আকাশের নীলে ভাসাভাসা মেঘ দেখে চোখ জুড়োলাম। ন্যাড়া জলে দাঁড়িয়ে একইভাবে খেয়ে যেতে লাগল। তা ছাড়া উপায় কি? ডাঙায় উঠলেই ক্ষুধিত কুকুর দুটি ওকেই বোধ হয় খেয়ে ফেলবে।

ন্যাড়ার খাওয়া হলে ওকে বললাম—নে, জিনিসগুলো ঠিক করে নে। নিয়ে চল, মেলায় একটু বেড়াই গে। তাছাড়া এইভাবে নদীর গর্ভে শুয়ে থাকাটাও ঠিক নয়। ঠাণ্ডা লাগতে পারে।

ন্যাড়া সঙ্গে সঙ্গে গুছিয়ে নিল সব।

দুজনে আবার জল পার হলাম। নদীর জলে কত মাছ। ন্যাংটা খোকারা গামছা পেতে সেই মাছ ধরছে।

ডাঙায় উঠতে কোলাহল আরো তীব্র হয়ে উঠল।

মেলা এখন বেশ জমে উঠেছে। দূরের যাত্রীরা যারা আসবার তারা সকলেই প্রায় এসে গেছে।

এখন শুধু লোকে লোকারণ্য। বাল-বৃদ্ধ, যুবা-নারী, যোগী ও সন্ন্যাসীর ভিড়। শাক্ত সৌর শৈব ও বৈষ্ণবের মেলা। বাবাজী স্বামীজি ভৈরব ভৈরবী আউল বাউল সাঁই ও দরবেশীর ছড়াছড়ি। কাপালিক গোরক্ষ-নাথিয়া সুরদাসী দশনামী রামানন্দী নির্মলি ও উদাসীর মাঝে বাণপ্রস্থী দণ্ডী ও নানকপন্থী তো আছেই। কেউ বাজায়

শিঙা, কেউ বাজায় বাঁশি, খোল মৃদঙ্গও বাজায় কেউ। কেউ নাচে, কেউ গায়, বাউল ও ঝুমুর গানে মেতে ওঠে কেউ।

শর খড় দড়ি বাঁশে আখড়া বাঁধা হয় কোথাও। মহোৎসবের তোড় জোড় চলে। ফুলকপি, বাঁধাকপি, টোম্যাটো, আলু ঝুড়ি ভর্তি বয়ে আনে বৈষ্ণব সেবার জন্য। মচ্ছবের জন্য।

তারই পাশে পাশে ঘুরে বেড়াই।

ওই দেখা যায় রাধামাধবের মন্দির। মন্দিরে যে যুগল বিগ্রহ জয়দেব গোস্বামী প্রতিষ্ঠা করেছেন, যে মন্দির মহারাজ কীর্তিচন্দ্রের জননী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত, সেই মন্দিরে গিয়ে বিগ্রহ দর্শন করে ধন্য হলাম।

কোথায় যেন মাইক লাগিয়েছে। মাইকে রেকর্ডের হিন্দী গান ভেসে আসছে। সেই দিক লক্ষ্য করে এগোতে লাগলাম।

এদিকে যত সব কুমোরদের আস্তানা। যাবতীয় মাটির জিনিস। থালা, গেলাস, বাটি থেকে মায় হাঁড়ি, কুঁড়ি, গামলা, সরা, কুঁজো, কলসি, কিছুটি বাদ নেই।

তারই একপাশে সারি সারি মাটির ঢিবি। কিন্তু ভারি বিচিত্র এই ঢিবিগুলি। বিচিত্র কেননা সত্যিই ওগুলো ঢিবি নয়। কাঁদি ভর্তি কলা তাড়াতাড়ি পাকাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ব্যবস্থা দেখে আশ্চর্য হলাম।

এসবের পরেই হ'ল যত রাজ্যের বই আর ছবির দোকান। রামায়ণ, মহাভারত, লক্ষ্মী চরিত্র, মেয়েদের ব্রতকথা, সত্যনারায়ণের পাঁচালি, কোক শাস্ত্র, সিনেমা সঙ্গীত, চণ্ডী, গীতা, একধার থেকে সব ঢেলে বিক্রি হচ্ছে।

এরই ঠিক মাঝামাঝি জায়গাটায় বসেছে 'দি নিউ বীণাপানি সার্কাস।' একটা লোক বাঁশের মটকায় বসে অনবরত রেকর্ডে গান দিচ্ছে আর মাঝে মাঝে চেঁচিয়ে যাচ্ছে—আসুন। দি নিউ বীণাপানি সার্কাস। এতে দেখতে পাবেন সাড়ে তিন বছরের বালিকা বেবি মায়া রায়ের সাতটি বোতলের ওপর মারাত্মক ব্যালেন্স। বাংলা বিহার উড়িষ্যার খ্যাতনামা সাইকেলিস্ট মিঃ রামা রাও এর এক চাকা দুচাকা ও আঠারো ফুট উঁচু চাকা সাইকেলের আশ্চর্য্যান্বিত ক্রীড়া কৌশল।

স্ট্যাণ্ড রোলার, স্ট্যাণ্ড সাইকেল, রাশিয়ান রকেট, লেডার ব্যালেন্স, চাইনিজ ল্যাসো, হরাইজেন্টাল বার ও সুন্দরী তরুণীদের তারের উপর চাঞ্চল্যকর নৃত্য। আরও দেখতে পাবেন মারাত্মক ত্রিফলা বর্শার খেলা। ও তারই সঙ্গে জোকারের হাস্য কৌতুক। টিকিটের হার মাত্র উনিশ পয়সা ও পঞ্চাশ পয়সা। আসুন। দি নিউ বীণাপানি সার্কাস।

সার্কাসের পাশেই পুতুল নাচ। সেখানে নৌকাবিলাস পালা। তারপরে ম্যাজিক। যাতুখেলা। চিনাবাদামওয়ালাদের সংসার।

ভিখারিদের আস্তানা।

তারপর শ্মশান।

কদমখণ্ডীর ঘাটের শ্মশান। শ্মশানেও মড়ার বদলে জ্যান্ত মানুষদের সংসার বসেছে।

শ্মশানের কোল ঘেঁষে নদীর ধারে ধারে বসেছে আর এক বসতি। ছোট কঞ্চি, গাছের পাতাওলা ডাল, নারকেল পাতা, তালপাতা ইত্যাদি দিয়ে তৈরি হয়েছে ছোট ছোট ঘর। ঘরগুলি উচ্চতায় এক বুকের বেশি নয়। কোন কোন ঘর মাটির সঙ্গে মিশে আছে। ঘরের মেঝেয় খড় কিংবা ঘাস বিছানো। ঘরের চালায় দড়ি দিয়ে বাঁধা তাল পাতা। দেওয়ালে মাটি বা অন্য কিছুর প্রলেপ নেই। দূর থেকে দেখলে এগুলিকে ঝোপ বলে ভ্রম হয়। এই সব ঝোপ ঘরের কোন কোনটির চারিধারে ঘাটের মড়াদের শোয়া কাঁথা কম্বল নয়তো বা পরা কাপড় জামা ঢাকা নেওয়া। এই ঘরের যারা বাসিন্দা তারা সবাই কুষ্ঠ-রোগী। পেশা এদের ভিক্ষে করা।

তারপর আরো কিছু দোকান পাট। এবং তারও পরে সেই ঘরখানি, যে ঘরখানিতে একদিন স্বয়ং ভগবান এসে লিখে গিয়েছিলেন 'স্মর গরল খণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং দেহি পদ পল্লব মুদারম।' এই ঘরের পাশেই রয়েছেন কুশেশ্বর মহাদেব। তাছাড়াও আরো অনেক দেখবার জিনিস আছে। সেগুলি কদমখণ্ডীর ঘাটের দিকে। যেমন রাধাবল্লভ ঠাকুরবাড়ি, মণিমোহন বটতলা, গঙ্গা কুমারীর বেদান্ত আশ্রম,

রামকৃষ্ণ আশ্রম, বেদনাশা আশ্রম, এই সব দেখতে দেখতে বেলা গড়িয়ে যায়।

বেলা গড়িয়ে গেলে গোধুলির কনে দেখা আলোয় রাঢ় বাংলার এই মেলাতলা অপরূপ হয়ে উঠল। সোনার বরণ মাটি ঝলমলিয়ে উঠল। মাটি যেন মেয়ে। দুষ্টু মেয়েটির মত শীতের পড়ন্ত রোদে ফিক ফিক করে হাসতে লাগল সে।

—আর তো পা চলছে না। এবার কোথাও একটু বসবা নাকি ?

—বসতে পারলে তো হয়। কিন্তু বসি কোথায় ?

—কাঙাল ক্ষ্যাপার আশ্রমে যাবা ?

—তাই চল।

দুজনে চলতে লাগলাম। চলতে চলতে এক জায়গায় খুব ভিড় দেখে থেমে গেলাম আমরা। এখানে নাকি 'কোটরে বাবা' নামে একজন সিদ্ধ পুরুষ থাকেন। আমরা ভিড় ঠেলে এগিয়ে গিয়ে কোটরে বসা 'কোটরে বাবা'কে দেখলাম। তারপর এগিয়ে চললাম কাঙাল ক্ষ্যাপার আশ্রমের দিকে।

চলতে চলতে ন্যাড়া বলল—একটা কত্থা বলব ?

—বল।

—দীক্ষার সময় গুরু আমাকে বল্যেছিল, যেমন করেই হোক কোন তীর্থস্থানে একটা মন্দির করে দিতে। গরীব ব্রাহ্মণ কন্যার বিয়া দিতে। আর···। আরো অনেক কিছু বল্যেছিল। তাই ভাবছি এখানে একটা মন্দির করে দিলে কেমন হয় ? তুমি রাজি আছো ?

—মন্দির করতে তো অনেক খরচ। তুই পাবি কোথায় অত টাকা ?

—আমি এক লাখ পর্যন্ত খরচ করতে পারি। তার ভিতরে হবে না একটা মন্দির ?

অবাক হয়ে গেলাম আমি। ব্যাটা বলে কি ! লাখ টাকা যে একসঙ্গে চোখেই দেখিনি কখনো। মালদহের লোকেরা মালদার হয় জানি। তবে এরকম মালদার যে হয় তা তো জানতাম না।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে ন্যাড়া বলল—আমার কথায় তোমার বিশ্বাস হোচ্ছে না বুঝি ? ভাবছ কোথাকার কে এক পাগল

প্রলাপ বকতেছে। তা যখন করব তখন দেখতেই পাবে। মেলা দেখে যাই, তারপর টাকা এলেই তোমাকে নিয়ে মালদহ চলে যাব।

কাঙাল ক্ষ্যাপার আশ্রম এসে গেল।

আশ্রমের পিছন দিকের মাঠে কিছু খড় জোগাড় করে বিছিয়ে তার ওপর সতরঞ্চি পেতে শুয়ে পড়লাম। ন্যাড়াও শুয়ে পড়ল আমার পাশে। তারপর হঠাৎ উঠে বসে আমার পা টিপতে লেগে গেল। আমি চমকে উঠে বললাম—কি ব্যাপার রে?

—কি আবার?

—তুই শেষকালে আমাকে পাপে ফেলবি না কি?

ন্যাড়া অমনি ঝাঁঝিয়ে উঠল—আহা! ন্যাকার মতো কত্থা শুনলে গা জ্বল্যে যায়। পাপ আবার কি গ? আমি তুমার ভাই না? সেই সকাল থেকে ঘুরছ, একটু না টিপ্যে দিলে চাঙ্গা হবে কেমন করে?

আমি আরাম করে শুলাম এবার। সারাদিনের ঘোরাঘুরির পর এমন আরাম হেলায় হারাই কখনো? টিপুক ব্যাটা যতো টিপতে পারে। যাচা অন্ন কাচা কাপড় ছাড়ে কে?

কতক্ষণ ন্যাড়ার সেবা নিচ্ছিলাম জানি না।

এমন সময় কানে এলো এক ভাঙা ভাঙা কণ্ঠস্বর—মশায়দের আসা হচ্ছে কোথা থেকে?

আমার চোখ বোজা ছিল। চোখের পাতা মেললাম। মেলে দেখলাম আমার সামনে এক বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে আছেন। বৃদ্ধের মাথার চুলগুলি পেকে গেছে সব। গায়ের চামড়া ঝুলে পড়েছে। হাতে লাঠি। চোখে চশমা। চশমার একদিকের আবার ডাঁটি নেই। সেদিকটা তাই সুতো দিয়ে বাঁধা। বললাম—বসুন বসুন। বলতে বলতে নিজেও উঠে বসলাম।

—আপনার নিদ্রার ব্যাঘাত করলাম না তো?

—না না, আমি তো ঘুমোই নি। আমি এমনি চোখ বুজে পড়েছিলাম।

বৃদ্ধ বললেন—আপনারা দুজনেই এসেছেন বুঝি? না আর কেউ এসেছে? মানে ফ্যামেলি ট্যামেলি?

—না, দুজনেই এসেছি। আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন?

বৃদ্ধ আমার পাশটিতে এসে বসলেন। বললেন—কোথা থেকে এসেছেন আপনারা?

—আমরা কলকাতার দিক থেকে এসেছি।

—এখানে উঠেছেন কোথায়?

—কোথাও না।

—এইভাবে মাঠে ঘাটে পড়ে থাকবেন?

—তাছাড়া উপায় কি বলুন?

—আমিও ভাই বড় মুস্কিলে পড়েছি। কোথাও ঘর পাচ্ছি না। এমন জানলে আসতাম না এখানে।

—কোথা থেকে আসছেন আপনি?

—আমি আসছি কাটোয়া থেকে।

—কাটোয়া! কাটোয়ার নাম শুনে লাফিয়ে উঠলাম আমি। বললাম—আপনি কাটোয়া থেকে এখানে আসতে গেলেন কেন? আপনার ঘরের কাছেই তো মেলা। উদ্ধারণপুরের ঘাটে।

—উদ্ধারণপুরের মেলা দেখে দেখে তো চুল পাকিয়ে ফেললাম ভাই। তবে এই মেলাটা দেখবার সখ আমার অনেক দিনের। তাছাড়া আমার বৌমা বললে, বাবা জয়দেবের মেলাটা আমায় দেখিয়ে নিয়ে এসো। তাই আরো এলাম। বৌমার টানেই এলাম।

—আপনার বৌমাও এসেছে নাকি সঙ্গে?

—সেইজন্যই তো ঘর খুঁজছি ভাই। কিন্তু কোথাও পাচ্ছি না। তাই ভাবলাম আপনারা যদি এখানকার কেউ হন বা আপনাদের সন্ধানে যদি তেমন ঘর টর থাকে।

—আর কে এসেছে আপনার সঙ্গে?

—আবার কে? আর কে আছে আমার? ছেলে ছিল। সেও নিরুদ্দেশ। ঐ বৌমা আর আমি।

—তা কই, কোথায় আপনার বৌমা?

—ঐ ওধারে। একটা গাছতলায় তাকে বসিয়ে রেখে এসেছি।

আমি দেখলাম অদূরে মেলার বাইরে একটি গাছতলায় এক তরুণী বধূ রান্নার কাজে ব্যস্ত। একেবারে ছেলেমানুষ বউ। মাঝারি ধরণের আঁটসাঁট চেহারা।

বৃদ্ধকে বললাম—আপনার সাহস তো কম নয়। এই মেলায় ওকে আপনি নিয়ে এলেন কোন সাহসে? ঘর ভাড়া তো পেলেন না এবার কি করবেন? সারারাত ওকে নিয়ে এই গাছতলায় থাকতে পারবেন? ভালো মন্দ কত লোক আছে এখানে তার ঠিক কি? তা ছাড়া আপনি বুড়ো হয়েছেন। এইভাবে ঠাণ্ডায় পড়ে থাকলে তো কাল সকালে পাত্তাই পাওয়া যাবে না আপনার।

—তাই তো বলছি ভাই, বড় বিপদ। গোবিন্দব ভরসায় বেরিয়েছি এখন তাঁর মনে যে কি আছে তা তিনিই জানেন।

আমি নির্বাক হয়ে বসে রইলাম। ন্যাড়ার মুখেও কথাটি নেই।

বৃদ্ধ বললেন—চলুন, চা খাবেন? বৌমাকে বলি চা করতে। এই ঠাণ্ডায় আর ভালো লাগছে না।

বললাম—চলুন। চায়ে না করব না। বিশেষ করে এমন পরিবেশে।

ন্যাড়া বলল—আমি যাব্বো না। তুমরা যাও। কি জাত তার ঠিক নাই। যার তার হাতে খেয়ে জাত খোয়াবো শেষকালে?

আমার মাথাটা হঠাৎ গরম হয়ে উঠল। ভাবলাম ব্যাটার মুখে সজোরে একটা পদাঘাত করি। কিন্তু মনে হলেও কাজে তো করা যায় না। তাই মনের ভাবটা জানাবার জন্য ন্যাড়ার দিকে আমি অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করলাম। বললাম—এত যদি জাত যাবার ভয় তো মেলায় এলি কেন? চায়ের দোকানে চা খাবার সময় জাত কোথায় ছিল তোর?

ন্যাড়া আমার রাগ দেখে মুষড়ে পড়ে বলল—দোকানে আবার জাত আছে নাকি?

বৃদ্ধ বললেন—তা ওর যদি মন না চায়···।

আমি বললাম—থাক তুই। আমি যতক্ষণ না আসি, ততক্ষণ শুয়ে থাক এখানে। বলে বৃদ্ধের পাশাপাশি চললাম।

অশীতিপর এই বৃদ্ধের তরুণী পুত্রবধূ আমার দিকে যে দৃষ্টিতে তাকাল তা প্রসন্ন কি অপ্রসন্ন ঠিক বোঝা গেল না।

বৃদ্ধ বললেন—মা, ইনিও আমাদেরই মতো নিরাশ্রয়। ভালো মানুষ বলেই মনে হচ্ছে। এনাকে একটু চা করে দাও। অমনি আমাকেও একটু দিও।

তরুণীর মুখে এবার ম্লান হাসি ফুটে উঠল একটু। গাছতলায় পাতা কাঁথা কম্বলের বিছানাটা অকারণেই একটু টেনে টুনে বলল—বসুন আপনারা। ভাতটা নামিয়ে আমি চা করছি।

বৃদ্ধ বসলেন। আমিও বসলাম।

কাঠের জ্বাল নিভে গিয়েছিল। বউটি তাই তাড়াতাড়ি ফু দিয়ে সেই নিভে যাওয়া কাঠ ধরাতে বসল। কাঠগুলো বোধ হয় রসালো। তাই ফু দিয়ে দিয়ে হায়রান হয়ে গেল বেচারি। কাঠ তবু ধরল না। আমি বললাম—আপনি একটু সরে বসুন। দেখি আমি চেষ্টা করে।

ধোঁয়া লেগে বউটির চোখ ছুটো তখন জলে ভরে এসেছিল। আঁচলের খুঁটে চোখের জল মুছে সে সরে বসল।

আমিও ছু'একবার জোরে জোরে ফু দিয়েও যখন হাঁফিয়ে উঠলাম বউটি তখন বলল—আবার তেল ঢেলে জ্বালতে হবে ভালো করে, নাহলে হবে না।

আমি নিজেই হাঁড়ি নামিয়ে শুকনো দেখে ছুটো কাঠ ফেলে তাতে একটু তেল ঢেলে ধরিয়ে দিলাম কাঠগুলো।

বৃদ্ধ বললেন—আপনি সরে আসুন ভাই, যা করবার বৌমাই করুক। এ সব কখনো আমাদের পোষায়?

আমি সরে এসে বৃদ্ধের পাশে বসলাম।

বৃদ্ধ বললেন—আপনারা খাওয়া দাওয়ার কি ব্যবস্থা করেছেন?

—সে রকম ব্যবস্থা কিছু করিনি। তবে চিড়ে চিনি সঙ্গে আছে। খিদে পেলে ভিজিয়ে খেয়ে নেবো।

—আমাদের এখানে সেবা করুন না ছুটি। অন্ন না খেয়ে সারাদিন আছেন। আমাদের হাতে খেতে আপত্তি নেই তো?

বললাম—না না। আপত্তি থাকবে কেন? তবে খেতে গেলে

আমি একা তো নই। আরো একজন আছে। আর তাছাড়া আমাদের জন্য ওনাকে কষ্ট পেতে হবে। একেই তো উনি হাঁফিয়ে উঠেছেন।

তরুণী একবার তাকিয়ে দেখল আমার দিকে। কিন্তু কিছু বলল না। ভদ্রতার খাতিরে সামান্য একটু অনুরোধও করল না যে, হ্যাঁ খান। তাতে কি হয়েছে। আমার কোন কষ্ট হবে না। সে সব কিছুই বলল না।

বৃদ্ধও আর কিছু বললেন না। শুধু একটা বিড়ি এগিয়ে দিলেন আমার দিকে। আমি বললাম—বিড়ি আমি খাই না। বলে মেলার ভিড়ের দিকে চেয়ে রইলাম। তারপর সেখান থেকে চোখ ফিরিয়ে তাকালাম বউটির দিকে। বউটি দেখতে শুনতে বেশ। সুন্দরী বলা চলে। বয়স কম। তাকে দেখে বড় মায়া হ'ল আমার। সে যে কঠিন কোন মনোবেদনায় ভুগছে তা তাকে দেখলে স্পষ্টই অনুভব করা যায়। সারা রাত ধরে মেলার বাইরে এই ফাঁকা মাঠে গাছতলায় এক অথর্বের ভরসায় যে কি করে থাকবে সে তা ভাবতেই গা'টা শিউরে উঠল। কত লম্পট, কত দুশ্চরিত্র, কত শয়তান আছে এখানে তার ঠিক কি? বৃদ্ধকে জিজ্ঞেস করলাম—আপনার ছেলে কতদিন নিরুদ্দেশ হয়েছে?

—এই বছর দুই হ'ল। ফুল শয্যার রাতে সেই যে পালালো আর এলো না। শুনেছি সে নাকি সন্ন্যাসী হয়েছে।

বড় দুঃখের কথা। বুড়ো বাপকে অসহায় অবস্থায় ফেলে রেখে এমন নব যুবতীর যৌবনের সাধ না মিটিয়ে যে মহাপাতক সন্ন্যাসী হয় সে যে কোন ভগবানের খোঁজে যায় তা জানতে সত্যই ইচ্ছা করে। বুদ্ধও ঘর-সংসার ছেড়ে দিয়ে সন্ন্যাসী হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি সংসার ছাড়লেও সংসারকে ভাসিয়ে দিয়ে যান নি। তিনি তো রাজপুত্র ছিলেন।

বউটির দিকে চেয়ে বড় দুঃখ হ'ল আমার। বেচারি। এমন সুখের যৌবন তিলে তিলে নষ্ট হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও সে যে বুড়োকে ছেড়ে চলে যায় নি এটাই বড় আশ্চর্যের। এমন মেয়েও আমাদের দেশে আছে?

বৃদ্ধ একবার কাসলেন। কেসে গলাটাকে পরিষ্কার করে বললেন—তাইতো! কি করি বলুন তো ভায়া?

—কিসের কি ?

—এই ঘর টরের ? সারারাত এখানে এই ফাঁকা জায়গায় তো থাকা যাবে না। এখনি তো আমার গলা ব্যথা করছে।

বউটি তু'কাপ চা আমাদের তুজনকে এগিয়ে দিল।

আমি বললাম—আপনার নেই ?

সে হেসে বলল—আমি চা খাই না।

এমন সময় ন্যাড়া এসে হাজির। বলল—আর নয়। চা খেয়ে এবার উঠো তো দেখি। বসে বসে আর ঠাণ্ডা লাগাতে হব্যে না। চলো কোথাউ রাত কাটাবার একটু জায়গা পাই কিনা খুঁজে পেত্যে দেখি।

আমারও আর এইভাবে ঠাণ্ডায় বসে থাকতে ভালো লাগছিল না। তাই চা খেয়ে উঠে পড়লাম।

বৃদ্ধ বললেন—আমাদের ভুলে যাবেন না যেন, আবার দেখা সাক্ষাৎ করবেন। কেমন ?

আমি কথা দিলাম। দিয়ে চলে এলাম।

সূর্য ডুবে গেছে অনেকক্ষণ। সূর্য ডোবার রঙও মুছে গেছে আকাশের পট থেকে। এবার অন্ধকার ছড়িয়ে পড়বে চারিদিকে। তবে অন্ধকার খুব বেশী গাঢ় হবে না। কেননা সামনেই পূর্ণিমা। চাঁদ এখন ভরন্ত।

আমরা সেই অস্পষ্ট অন্ধকারে চলতে চলতে যেখানে গিয়ে ঠেকলাম সেটা বেদনাশা আশ্রম। আশ্রমের সামনে বাঁশ পুঁতে ত্রিপল টাঙিয়ে লাল সাদা কাপড় ঘিরে ষ্টেজ বাঁধা হচ্ছে। মাইক আনা হয়েছে ভাড়া করে। এই আসরে তিন দিন তিন রাত্রি শুধু বাউল গান হবে। দেশ রাজ্যের যত বাউল সবাই এখানে এসে সঙ্গীত পরিবেশন করবে। আসরের এক কোণে একটি উঁচু বেদীতে খড়ের গাদা বিছিয়ে তার ওপর গদী পাতা হচ্ছে। আশ্রমের মোহান্ত মনোহর ক্ষ্যাপা এখানে বসবেন। আসরের মাঝখানেও খড় বিছিয়ে তার ওপর চট পাতা হয়েছে লোক-জনের বসবার জন্য।

—ভালই হয়েছে। রাতটা এখানেই কাটানো যাবে। ঠাণ্ডাও লাগবে না। গান বাজনা শুনে দেখতে দেখতে কেটে যাবে রাত।

—এখান থেক্যে আর কোত্থাউ নড়ছি না আমি। বুঝলা? বলেই আসরের মাঝখানে ধপ করে বসে পড়ল ক্ষ্যাড়া।

আমিও বসলাম।

শুধু আমরা নয়। দলে দলে লোক এসে বসতে লাগল সেখানে। ওই আশ্রয়টুকুর লোভে। এই ফাঁকা মাঠ আর গাছতলার রাজ্যে এই

আশ্রয়টুকুই কি কম? রাত কাটানোর মতো এমন নিরাপদ আশ্রয় আর কোথায় পাবো?

বড় বড় হ্যাজাক জ্বলছে চারিদিকে। তারই জোরালো আলোয় আলোকিত চারিদিক। আলো-আলো আর আলো। সেই আলো ঝলমল আসরের মধ্যিখানে নৈবেদ্যের ওপর সাজানো কলার মতো ন্যাড়া শুয়ে পড়ল হাত পা ছড়িয়ে দিয়ে।

—এই ব্যাটা, ওঠ।

—আঃ। ঘুম পাচ্ছে।

—তাতো পাচ্ছে। কিন্তু খানিকবাদে যখন তুলে দেবে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে তখন? তখন কি হবে? তার চেয়ে নিজের মান নিজের কাছে রেখে উঠে বোস।

—যখন বলবে তখন উঠব। এখন একটু গড়িয়ে নিই কেন। বড় ঘুম লাগছে। বিরক্ত করবা না, বুঝলা?

ঘুম যে আমারও আসছে না তা নয়। ঘুমে দু'চোখ জড়িয়ে আসছে। অথচ এই তো সবে সন্ধ্যে রাত, সমস্ত রাত্রিটাই এখনো বাকি। আর যা ঠাণ্ডা পড়েছে তাতে মাঠে ময়দানেও পড়ে থাকা যায় না। মহা মুশকিল। ন্যাড়া কেমন গুছিয়ে নিল। কিন্তু আমার তো সে উপায় নেই। সঙ্গের জিনিসপত্তরগুলোও উধাও হয়ে যাবে তাহলে। সারাদিনের সকল ক্লান্তি যেন নিষ্ঠুরভাবে চেপে ধরল আমাকে।

ন্যাড়ার দেখা দেখি আরো একজন একদিকে শুয়ে পড়ল। তার দেখা দেখি আর একজন।

আমার মনে হ'ল আমিও যদি এই রকমভাবে একটু শুয়ে পড়তে পারতাম তাহলে মন্দ হোত না।

ন্যাড়ার গায়ে কার যেন পা ঠেকাল। আর যায় কোথা। অমনি কাঁই কাঁই করে উঠল ন্যাড়া—মারব এক চড়। বুড়া মাগ্‌গী, দেখ্যে চলতে পারিস না? কোথাকার কে, কি জাত তার ঠিক নাই, পেন্নাম কর শীগ্‌গির।

যাকে বলা হ'ল কথাটা তার তো তখন মূর্তি অন্যরকম—কোন ইয়ের ব্যাট্টারে তুই? তুই মারবি মোর গালে চড়। মার, মার দেখি কত্তো বড় সাহস তোর। এই গাল পেত্যে দিনু। এটা শোবার জায়গা, লয়?

—কি ! তুই ইয়ের ব্যাট্টা বললি ? আমি যদি ইয়ের ব্যাট্টা তো তুই তবে ইয়ের বেট্টি। নরকে যাব্বি তুই। বামুনের ছেল্যের গায়ে পা দিলি।

—এঃ। বামুনের ছেলে। ব্যাটা চামার। মুখে লাথি মারি অমন বামুনের।

হাওয়া খারাপ। ন্যাড়া তো ঝেড়ে উঠে বসেছে—আজ তোর গলা টিপ্যে শেষ করে ছুব্বো।

আমি চেপে ধরলাম ন্যাড়ার হাত দুটো। ওর বোধ হয় লো প্রেসার। মাথা গরম হয়ে কানের পাশ দুটো লাল হয়ে উঠল। ওর হয়ে আমি বললাম—ওকে আপনি ক্ষমা করুন মা। ও আপনার ছেলের মতো।

—মুখে আগুন অমন ছেলের। অমন ছেলে আমার নিজের থাকলে আমি তাকে বিষ খাইয়ে মারতুম।

গতিক সুবিধের নয়। আরো পাঁচজনে তখন মারমুখো হয়ে উঠেছে। সকলেরই লক্ষ্য তখন ন্যাড়ার দিকে। নেহাৎ ওর পাশে আমাকে সম্ভ্রান্ত গোছের দেখে কেউ কিছু বলতে পারছে না।

—আমায় বলে কিনা মাগী, তোর মাকে বল্গবি, মাসীকে বলবি।

আমি ন্যাড়ার অলক্ষ্যে নিজের মাথার কাছে হাতের আঙুলটা এনে চোখ মুখের এমন এক ভঙ্গিমা করলাম যাতে সকলেই চমকে উঠল। চমকে উঠল মানে বুঝে নিল। বুঝে নিল বিবাদীর মাথার ঠিক নেই। যিনি ঝগড়া করছিলেন তিনিও আমার ইশারা বুঝে গুঁই গাঁই করে থেমে গেলেন। শুধু থেমেই গেলেন না, একটু সরেও বসলেন। দু'একজন ন্যাড়াকে থামাবার জন্য মিষ্টি করে কথা বলল—যা হবার হয়ে গেছে, এবার থামো না বাপু। মেলায় এসে কখনো ঝগড়া বিবাদ করতে আছে ?

ন্যাড়ার তখনো দাঁত কড়মড় করছে। চোখ ঘুরছে।

পাশের একজন চুপি চুপি জিজ্ঞেস করল—হ্যাঁ মশাই, কামড়ে টামড়ে দেবে না তো ?

—বিশ্বাস কি ! চেপে যান। কেউ যেন ঘাঁটাবেন না ওকে।

আর কেউ ঘাঁটালো না। ন্যাড়াও আবার শুয়ে পড়ল।

যারা আসর পাতছিল এতক্ষণে তারা সমবেত লোকজনদের বলল—দেখুন, আপনারা বেশী গোলমাল করবেন না। রাত দশটা থেকে আমাদের অনুষ্ঠান আরম্ভ হবে। ততক্ষণ পর্যন্ত এখানে আপনারা থাকতে পাবেন। তারপর বাবার শিষ্যরা এসে গেলেই জায়গা খালি করে দিতে হবে আপনাদের। এ জায়গা আপনাদের জন্য নয়।

মাথাটা যেন বাঁই করে ঘুরে গেল। এ জায়গা শুধুমাত্র বাবার শিষ্যদের? অপর কারো নয়? এ যে সর্বনাশা কথা। এখান থেকে বার করে দিলে যাবো কোথায় আমরা? এই মাঠে ঘাটে কোথায় পড়ে থাকব? সারারাত ফাঁকায় পড়ে থাকলে তো কাল সকালে আর দেখতে হবে না। ডবল নিউমোনিয়া ধরে যাবে।

—ন্যাড়া! কি করা যায় বল তো?

—কি আবার করবে? এখান থেক্যে উঠলে তো।

—কিন্তু ওরা যদি জোর করে তুলে দেয়?

—এঃ। দিলেই হ'ল? কামড়ে ছিঁড়ে দুবেো না!

—অমন কাজটি করিস না। শেষকালে জেলে যাবি।

—যাই যাবো আমি যাবো, তুমার কি গ! এখন কটা বাজে খালি জেন্যে নাও।

একজনকে জিজ্ঞেস করলাম—কটা বাজে মশাই?

যাকে জিজ্ঞেস করলাম তিনি কানেই নিলেন না কথাটা। আর একজনকে করা হলে তিনি বললেন 'পনেরো'। শুধু পনেরো। কটা পনেরো তা কিছু বললেন না। ঘড়ির কাঁটায় পনেরোটা তো বাজে না, তাই আরো একজনকে জিজ্ঞেস করতে হ'ল। এতক্ষণে উত্তর মিলল ঠিক। ছটা পনেরো।

শুনেই মাথায় হাত দিলাম।

—এই সবে ছটা পনেরো! আমি না জানি কত রাত।

—তা ঐ রকমই হবে বৈকি। শীতের বেলা। পাঁচটায় তো সন্ধ্যে।

—আমার যে ঘুমে চোখ ঢুলে আসছে। সারাটা রাত কাটাবো কেমন করে বল তো?

—শুয়ে পড়ো না। যেটুকু পারো ঘুম্যে নাও। তারপর দেখাযাবে।

শুয়েই পড়লাম আমি। যেটুকু ঘুম হয় সেইটুকুই লাভ। কম্বলটা ব্যাগটা কোলের কাছে টেনে নিয়ে শুয়ে পড়লাম। মনে মনে ভাবতে লাগলাম এমন জব্দ আমি কোনদিন হইনি। কালীপূজায় শিবরাত্রিতে দূরগামী ট্রেনের কামরায় কত রাত যে জেগেছি, কিন্তু এমন ঘুম তো আমার কখনো পায়নি। সন্ধ্যে না হতে হতেই ঘুম। ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়েই পড়লাম।

ন্যাড়ার ঠ্যালা খেয়ে ঘুম যখন ভাঙল তখন আমার মুখের কাছে ঝুঁকে আছে ন্যাড়া।

—বাবাঃ। আচ্ছা ঘুম ঘুমোতে পারো বটে। সেই কখন থেক্যে ডাকছি। এইরকম ঘুম নিয়ে মেলা বেড়াতে আসছ ?

আমি উঠে বসলাম। কত রাত কে জানে। হ্যাজাকের আলো সমানে জ্বলছে। চারিদিকে লোকজনের হৈ চৈ। মাইকের ফঙ ফঙ শব্দ।

—এখন রাত কত ?

—কত আবার ? এই সাড়ে আটটা।

এবার আমার ডাক ছেড়ে কান্না পেল। এখন যদি সাড়ে আটটা হয়...তবে বাকি রাতটা কাটাবো কেমন করে ? কি কালের ঘুম যে আমায় পেয়ে বসেছে তা ভগবানই জানেন।

—নাও, এবার উঠো দেখি। আসো আমার সঙ্গে।

—ক্ষেপেছিস নাকি ? এই রাতের অন্ধকারে যাবি কোন চুলোয় ? তার ওপর এই ঠাণ্ডায় ?

—আঃ এ লোকটাকে নিয়ে আর পারা গেল না। আমি যেখানে নিয়ে যাবো যা করব তুমি একটা কথাও বলবা না, বুঝলা ?

—তার মানে ?

—তার মানে তুমি আসো তো আমার সঙ্গে। সারারাত কি এইখানেই পড়ে থাকবে নাকি ?

ন্যাড়া কোথায় যে নিয়ে যেতে চায় বুঝতে পারলাম না। কিন্তু না পারলেও আমি তারই ওপর নির্ভর করে তার পিছু পিছু চলতে লাগলাম। আসরের বাইরে আসতেই কেঁপে উঠলাম আমি। প্রচণ্ড শীত যেন নাছোড়বান্দার মতো জাপটে ধরল আমাকে। আমি ঠক

ঠক করে কাঁপতে লাগলাম। পৌষের কনকনে শীতে ওপর আর নিচের দাঁতে লেগে গেল ঠোকা ঠুকি। তবু তো পরণে আণ্ডার প্যাণ্ট, ফুল প্যাণ্ট, গেঞ্জি, সোয়েটার তার ওপর ফুলহাতা টার্কিসের জামা রয়েছে গায়ে। মাথায় সুন্দর কাশ্মিরী টুপি আছে। এতেও বাগ মানল না শীত। আমাকে নিষ্ঠুরভাবে পেয়ে বসল।

বাউল গানের যে ষ্টেজটি নির্মাণ করা হয়েছে তার সামনেই যে আশ্রম সেই আশ্রমের দিকে চললাম দুজনে। আশ্রমের দরজায় দু'দুজন জাঁদরেল গোছের দরোয়ান দাঁড়িয়েছিল। যারা দাঁড়িয়েছিল তারা আমাদের দিকে এক নজর তাকিয়ে দেখল বটে তবে আমাদের ভিতরে ঢুকতে কোন রকম বাধা দিল না।

ন্যাড়ার পিছু পিছু গেট পেরিয়ে ভিতরে ঢুকতেই দেখলাম সেখানে বিরাট এক যজ্ঞির আয়োজন হয়েছে। একটা উনুনে ভাত ফুটছে ভর ভর করে। আর একটায় তরকারি। কিছু লোক রান্না করছে, কিছু লোক আয়োজন করছে, কিছু লোক নিজেকে নিয়েই নিজে ব্যস্ত। মোট কথা সকলেই এখানে কর্ম তৎপর। যে যার কর্ম সে তার করে যাচ্ছে। সেখানটা পার হয়ে আমরা আশ্রমের চাতালে গিয়ে উঠলাম। বারান্দার মতো চাতাল। একদিক ফাঁকা। সেই চাতালে কম্বল মুড়ি দিয়ে জনা দুই বসেছিলেন। তারা আমাদের দেখে বললেন—এই যে এদিকটায় আসুন।

যেদিকটা দেখানো হ'ল আমরা সেই দিকেই গেলাম। সেখানে গিয়ে সতরঞ্জি বিছিয়ে ন্যাড়া বলল—নাও। এবার মনের আনন্দে ঘুমাও। খাবার সময় ডাকব। তখন উঠবা।

আমি কিছুই বুঝতে পারছিলাম না যদিও তবুও আমার মনে হচ্ছিল ন্যাড়াকে বুকে জড়িয়ে ধরি। কোন ফাঁকে যে ও এখানটা ম্যানেজ করেছে তা ও-ই জানে।

আমাকে শুইয়ে ন্যাড়া উধাও হয়ে গেল।

একজন জিজ্ঞেস করলেন—আপনি কি ওনার সঙ্গে এসেছেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আপনারা আজ রাত্রে আমাদের এখানে সেবা করবেন। কেমন? আমাদের ক্ষ্যাপা অনুমতি দিয়েছেন আপনাদের এখানে থাকবার।

—ক্ষ্যাপা !

—হ্যাঁ। মনোহর ক্ষ্যাপা। ক্ষ্যাপাকে জানেন না ?

—জানি। এটা বেদনাশা আশ্রম নাকি ?

—হ্যাঁ।

আমি কৃতার্থের হাসি হাসলাম।

যথাসময়ে ন্যাড়া আবার এলো। এসে বলল—সব ঠিক করে এলাম। কাল সকালে কথা বার্তা পাক্কা করে সামনের মাস থেকে কাজ সুরু করব।

—কিসের কাজ ?

—ওমা ! এরই মধ্যে ভুল্যে গেলে ? মন্দির করবার কথা বলছিলাম না তখন, সেই কাজ। শুভস্য শীঘ্রম। ক্ষ্যাপার সঙ্গে কথা বললাম। তুমি তো প'ড়ে প'ড়ে নাক ডাকাচ্ছিলে, সেই ফাঁকে এখানে এস্যে বাবার কাছে বলছিলাম, যে এখানে মন্দির বানাবার কথা। তা ক্ষ্যাপা বললেন, ওনাদের মন্দিরের চূড়াটুড়াগুলো বাঁধিয়ে দিতে। আমি বললাম, সে রকম তো নয়, একেবারে নতুন করে মন্দির আমি গাঁথব। জায়গা কিন্যে আমার নামে মন্দির বানাব আমি। তখন ক্ষ্যাপা বললেন, আজ উনি ব্যস্ত, কাল সক্কালে সব কথা টথা পাক্কা করবেন।

—তাহলে সত্যিই তুই মন্দির দিবি ?

—বাঃরে। দুবেবা না ? তুমি কি ভাবছ আমি ইয়ার্কি করতেছি ? ক্ষ্যাপার কাছে আমার গুরু ওঙ্কারনাথের নাম করলাম। ক্ষ্যাপা বললেন, আমি চিনি তোমার গুরুকে। তারপর তোমার কথা বললাম যে আমার এক দাদ্দা এসেছে সঙ্গে, তাকে একটু থাকবার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। তা ক্ষ্যাপা দুজনকেই থাকতে বললেন।

আমি ন্যাড়ার পিঠ চাপড়ে বললাম—তুই ব্যাটা কাজের আছিস রে। ভাগ্যিস তোকে এনেছিলাম সঙ্গে।

—তব্বে্য ? এখন আমিই তুমার গার্জেন। বুঝলা ? ঘুমোও তুমি পড়ে পড়ে। মনের আনন্দে নাক ডাকাও।

আমি আয়েস করে শুলাম সতরঞ্জি বিছিয়ে, কম্বল মুড়ি দিয়ে। কিন্তু গোল বাধাল প্রচণ্ড শীত। চাতালের একপাশ ফাঁকা। যে পাশ ফাঁকা সেই পাশ দিয়ে হু হু করে শীতের বাতাস আসতে লাগল অজয়ের। আর মেঝে ফুঁড়ে উঠতে লাগল বরফের মতো ঠাণ্ডা।

ন্যাড়ার বুঝি শীত নেই। ও গায়ের কাপড় মুড়ি দিয়ে দিব্যি বসে রইল চুপচাপ।

রাত দশটা নাগাত খাবার ডাক পড়ল আমাদের। খোলা উঠোনে সারি সারি পাতা পড়ল। বসবার আসন নেই, উপু হয়ে খেতে হবে। তাই ভালো। এমনিতে যা পাওয়া যায় এখানে তাই লাভ। কন কনে ঠাণ্ডায় খোলা উঠোনে আর সকলের সঙ্গে আমরাও বসে পড়লাম।

কালো হোঁৎকা মতো একটা লোক হেঁড়ে গলায় বলল—দেখিস বাইরের কেউ যেন ভিড়ে না যায়। মুখ চিনে খেতে দিবি।

যাকে বলল সেও অমনি মুখের কথাটি কেড়ে নিয়ে বলল—সে তোমাকে বলতে হবে না কত্তা। সেদিকে আমি কড়া নজর রেখেছি। একটা কাক চিলও ঢুকতে দিইনি ভেতরে। বলতে বলতেই লোকটি অন্নের বালতি এনে ধোঁয়া ওঠা গরম অন্ন পেতলের হাতায় করে ভূঁয়ে পাতা শাল পত্রে গাদা গাদা পরিবেশন করতে লাগল। আর একজন সঙ্গে সঙ্গে গরম অন্নের ওপর গড় গড়ে ডালের শ্রোত নিমেষের মধ্যে বইয়ে দিল। তারপর এলো তরকারি। ফুলকপি, বাঁধাকপি, শিম, বেগুন, আলুর ঘঁ্যাট। ঘঁ্যাট ফুরোতে না ফুরোতেই লাউয়ের চাটনি। চারিদিকে শুধু হাপুস হুপুস শব্দ। যে যত পারছে খাচ্ছে।

দরমার গেটের বাইরে একজন করুণ নয়নে চেয়েছিল সকলের পাতের দিকে। খানিকক্ষণ দেখে সে এবার ঘ্যান ঘ্যান করতে লাগল— জয় হোক বাবারা। দয়া করে আমার একটু সেবার ব্যবস্থা করে দেন।

কালো মতো হোঁৎকা লোকটি অমনি মুখিয়ে উঠল—বলেছি তো কাল আসিস। কাল থেকে তিনদিন মহোৎসব। পেট ভরে খেতে পাবি দুবেলা। আজ হবে টবে না।

—পেটের জ্বালায় মরে যাচ্ছি বাবা, দয়া করে একমুঠো দেন আমাকে।

—একমুঠো! একদানাও দেওয়া হবে না কাউকে। আজ শুধু বাবার শিষ্যরা সেবা করবে এখানে।

—আমি বড় ক্ষুধার্ত বাবা।

—সে তো বুঝলুম। কিন্তু উপায় নাই। তোমাকে একজনকে দিলে তো হবে না, আর পাঁচজনেও ছেঁকে ধরবে যে।

—তোমার পায়ে পড়ি বাবা।

কিন্তু না! পায়ে পড়াতেও দয়া হ'ল না লোকটির। বলল—আঁস্তাকুড়ে যাও। এঁটো কাঁটা অনেক পড়বে। এর ওর পাতের ছিটে ফোঁটা অনেক পাবে সেখানে। এখানে কিছু হবে না।

এমন লোভের অন্ন একজনের পেটের জ্বালায় জ্বলে মরার দৃশ্যের সম্মুখে সত্যিই মুখে ওঠে না। আমার চোখ দুটি সজল হয়ে উঠল। আর সকলে কিন্তু ভ্রূক্ষেপও করল না সেদিকে। তারা আগের মতোই সমানে হাপুস হুপুস শব্দ করে গোগ্রাসে গিলতে লাগল। এমন অবস্থাতেও মানুষ যে কি করে খেতে পারে তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। একজন একমুঠো অন্নের জন্য পায়ে ধরছে আর একজন সেই অন্ন তারই চোখের সামনে দলায় দলায় মুখে তুলে নির্বিকারভাবে গিলে খাচ্ছে। এদেরই নাম মানুষ, এদের নিয়েই সমাজ, এদের নিয়েই সভ্যতা। আমার খাওয়া হ'ল না। আমি খেতে পারলাম না। আমার মন চাইছিল লোকটিকে ডেকে দুমুঠো অন্ন তার হাতে তুলে দিতে। কিন্তু ইচ্ছে থাকলেও সে উপায় নেই আমার। আমিই তো আশ্রিত। অতিথি। এমন কি শিষ্য পর্যন্ত নই। কাজেই আল ডিঙিয়ে ঘাস খেতে যাওয়া আমার পক্ষে কি করে সম্ভব?

খাওয়া দাওয়ার পাট চুকলে যে যার এঁটো পাতা হাতে নিয়ে বাইরে চলে গেল। আমরাও চললাম। তারপর এক জায়গায় সেগুলো দলা পাকিয়ে ফেলে দিয়ে অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে নদীতে নেমে বরফের চেয়েও ঠাণ্ডা কন কনে অজয়ের জলে মুখ হাত ধুয়ে ওপরে উঠে এলাম। তারপর আবার আশ্রমে ফিরে শুয়ে পড়লাম যে যার।

কিন্তু শুয়ে পড়লে কি হবে। ঘুম আর আসে না পোড়া চোখে।

চারিদিকে তখন দারুণ হট্টগোল। রাতের নীরবতায় মেলার মুখরতায় তুমুল কাণ্ড। এদিকে মাইকে আরম্ভ হয়েছে বাউল গান। বাংলার বিখ্যাত পূর্ণদাস নেচে নেচে গাইছেন। আর ওদিকে বিহারি সন্তদের খোল ঢোল পিটিয়ে চলেছে 'রামা গুজালিয়া হো…।' এর মাঝে কি ঘুম আসা সম্ভব? ঘুম না আসার আর এক কারণ এই শীত। পৌষের শীত এই মকর যোগে যেন চতুর্গুণ বেড়ে উঠেছে। চাতালের একটা দিক ফাঁকা থাকায় ঠাণ্ডাটা সারা গায়ে এমনভাবে বিঁধছে যে সে ঠাণ্ডার উপমা নেই। শুধু তাই নয়, শান বাঁধানো মেঝেটাও যেন মনে হচ্ছে বরফ। বরফের ওপর যেমন শুয়ে থাকা যায় না, এখানকার মেঝেতেও তেমনি শুয়ে থাকা যায় না। এর চেয়ে আগেকার আশ্রয়টা, মানে বাউলগানের সেই আসরটা ঢের ভালো ছিল। সেখানে সানের বদলে খড় ছিল, চারিদিক ছিল ঘেরা, আর ছিল হ্যাজাকের আলো ও লোক-জনের গরম। সে আশ্রয়টা ছেড়ে এসে ভুল হয়েছে। শীতে কাঁপতে থাকলে ঘুম তো ঘুম ঘুমের বাবাও চোখে আসে না এবং এই না আসাটা যে শরীরের পক্ষে কতখানি অস্বস্তিকর তা একমাত্র ভুক্তভোগীরাই জানে। আমার যেন কান্না পেতে লাগল।

ন্যাড়া কিন্তু অঘোরে ঘুমোচ্ছে। ভোঁস ভোঁস করে নিঃশ্বাস পড়ছে তার নাক থেকে। ওর গায়ে বুঝি গণ্ডারের চামড়া। শীত ওর গায়ে সুড়সুড়ির মতো। একটু কিছু চাপা দিলেই চুকে যায়। কম্বলের একটা প্রান্ত আলতোভাবে চাপা দিয়ে শুয়েছে। তাতেই এই মহানিদ্রা।

আমার ঘুম হ'ল না। মেঝের ঠাণ্ডা যখন খুব বেশী অসহ্য বলে মনে হ'ল তখন উঠে বসলাম। বসে থাকতেও যখন কষ্ট হতে লাগল তখন আবার শুয়ে পড়লাম। সারাটা রাত্রি ধরে কেবল বসা আর ওঠা, ওঠা আর শোয়া এই চলল একভাবে। এই রকম করতে করতে হঠাৎ যাদের কথা আমার মনে পড়ে গেল তাদের কথা ভাবতেই আনচান করে উঠল মনটা। এই দারুণ শীতে না জানি কত কষ্টই হচ্ছে তাদের। ফাঁকা মাঠে গাছতলায় কি করছে কে জানে?

আমি উঠে বসলাম। মধ্যরাতের মেলাতলা একতারার তানে আর বাউলের গানে জমে উঠেছে তখন।

ন্যাড়া ঘুমোচ্ছে অঘোরে। তা ঘুমোক। এখানে জিনিস পত্তর চুরি যাবার ভয় নেই। কম্বলটা ওর গায়ে আপাদমস্তক চাপা দিয়ে কাশ্মিরী টুপিটা মাথায় দিয়ে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালাম। তারপর চাতাল থেকে নিচে নেমে উঠোনের পাশে যেখানে চটিটা ছিল সেখানে গিয়ে চটি দুটো পায়ে গলিয়ে খুব সন্তর্পণে আশ্রমের গেট পেরিয়ে বাইরে এলাম। বাইরেটা যেন এক আলাদা জগৎ। চিমনি আর লণ্ঠনের আলোয় মিট মিট করছে। চারিদিকে অন্ধকার। অন্ধকারেই ঠোক্কর খেতে খেতে এগিয়ে চললাম গন্তব্য পথের দিকে। মেলার ভিড় কাটিয়ে যখন ফাঁকা মাঠে এসে পৌঁছলাম তখন আমার সারা গায়ে কেমন যেন শিহরণ উঠল। যে গাছতলায় তারা রয়েছে সেটা ঠিক ঠাওর করতে পারছিলাম না যদিও তবুও আন্দাজে ভর করে এগিয়ে চললাম। এই যাওয়ার মধ্যে যে কি সার্থকতা আছে তা জানি না, তবুও চললাম।

এক দুর্বার আকর্ষণ যেন আমাকে টেনে নিয়ে চলল গাছতলায়। কিন্তু দেখলাম সব ভোঁ ভাঁ। কাকস্য পরিবেদনা সেখানে। অন্ধকার গাছতলা খাঁ খাঁ করছে। কেউ কোথাও নেই।

আমি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। এই শীতে কষ্ট করে এতখানি আসাই সার হ'ল। মনে মনে ভাবতে লাগলাম মানুষ দুটো গেল কোথায়? কোথায়ই বা যেতে পারে? ঘর তো কোথাও পাবে বলে মনে হয় না। তবে কি মেলার ভিড়ে বাউল বৈরাগীদের আড্ডায় গিয়ে জমেছে? হয়তো তাই। যাক। যেখানে হোক আশ্রয় এই রাতটুকুর মতো পেয়েছে নিশ্চয়ই। পেয়ে থাকে তো ভালোই হয়েছে।

দূরে এক জায়গায় কারা যেন খড় জেলে আগুন করছে। আমি সেই দিকেই পা বাড়ালাম। সেখানে আগুনের আলোয় কয়েকজন এ দেশীয় নারী পুরুষকে অস্পষ্টভাবে দেখা গেল। হয়তো তারা ওখানেও থাকতে পারে। সেই ভেবেই সেই আলোটা লক্ষ্য করে আমি পথ চলতে লাগলাম। কিন্তু না। তারা সেখানেও নেই। এবার আমার রাগ হ'ল নিজেরই ওপর। কি দরকার ছিল সুখে থাকতে ভূতে কিলোবার। বেশ তো ছিলাম আশ্রমে। এতখানি পথ এসে শুধু শুধু হায়রানি হলাম।

আশ্রমে ফিরে এসে দেখলাম ন্যাড়া তখনও শুয়ে আছে সেই অনন্ত শয়নে। পা থেকে মাথা পর্যন্ত কম্বল মুড়ি দিয়ে হাড় গোড় ভাঙা দ'য়ের মতো ড্যালা পাকিয়ে শুয়ে আছে। মাঝে মাঝে ঘুমন্ত অবস্থায় শিশুর মতো দেয়ালা করছে। কখনো বিড় বিড় করে বকছে। কখনো মিটমিটিয়ে হাসছে। ধেড়ে খোকার কাণ্ড দেখে গা জ্বলে গেল। গায়ে ধাক্কা দিয়ে ডাকলাম—এই, ন্যাড়া!

—উঁ। বলেই আবার পাশ ফিরে শুলো সে।

—ওঠ। ওঠ।

—দাঁড়াও সকাল হোক।

—গায়ে জল ঢেলে দেবো এবার।

জল আর ঢালতে হ'ল না। আপনা থেকেই উঠে বসল ন্যাড়া। চোখ রগড়াতে রগড়াতে বলল—শুধু শুধু দিল্যে তো কাঁচা ঘুমটাকে নষ্ট করে।

—আর ঘুমোতে হবে না। ওঠ। একটু পায়চারি করে রাতটা কাটিয়ে দিই চল। এখানে এক জায়গায় বসে থাকলে জমে বরফ হয়ে যাব।

ঘুরতে পেলে ন্যাড়াও আমার মতো আর কিছু চায় না। কাজেই লাগাম ধরে টান দিতেই লাফিয়ে উঠল ঘোড়া। সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসে গায়ের কাপড়টা মাথায় কানে ঢেকে সারা গায়ে জড়িয়ে নিল। আমিও কম্বলটা চাদরের মতো করে জড়িয়ে নিলাম সারা গায়ে। নিয়ে ধীরে ধীরে পথে নামলাম।

বাউলগান তখনও সমানে চলেছে। গানের কলি ভেসে আসছে লাউড স্পীকারে—

এসে এই ভবের হাটে
মিছেইরে তোর বেলা কাটে
বেগার খেটে নগদা মুটে তুই হলি—।

গান শুনতে শুনতেই আমরা চলতে লাগলাম। মণিমোহন বটলতার নিচে কয়েকজন সাধু ধুনি জ্বালিয়ে গল্প করছিল। আমরা ভিড়ে গেলাম সেখানে।

সাধুরাও একটু নড়ে চড়ে বসে জায়গা করে দিল আমাদের।

ধুনির আঁচে গরম হয়েছিল চারিদিক। তাই বেশ আরাম বোধ হতে লাগল।

একজন সাধু জিজ্ঞেস করল—আপনারা কোথা থেকে আসছেন ?

যেখান থেকে আসছি সেখানকার নাম বললাম।

—তা বেশ বেশ। এই বয়সে মেলা বেড়াচ্ছেন সাধুসঙ্গ করছেন আপনারা পুণ্যাত্মা বটে।

আমি হাসলাম। হেসে বললাম—আপনাদের থেকেও ?

—আমরা তো জাত ভিখিরি ভাই। ভেক নিয়ে ঘুরে বেড়াই। কিন্তু আপনারা তো তা নন! লেখাপড়া করেন। সংসার ধর্ম পালন করেন। আবার সাধু সঙ্গেও মিশতে ছাড়েন না। পুণ্য তো আপনাদের।

বললাম—নদীর এ পার কহে ছাড়িয়া নিঃশ্বাস, ওপারেতে যত সুখ আমার বিশ্বাস।

—তা যা বলেছেন। তাহলেও আমাদের এই জীবনটা কি জানেন, বড় কষ্টের জীবন। এত কষ্টের যে তা বলবার নয়। এই কষ্টের ভেতর দিয়ে ভগবানকে ডাকা কি চাট্টিখানি কথা ? ঈশ্বর চিন্তার চেয়ে পেটের চিন্তাই বেশি আমাদের।

এই রকম সব কথাবার্তা কইছিলাম আমরা। এমন সময় চারিদিক থেকে শঙ্খ ঘণ্টা বেজে উঠল।

সাধুরা বললেন—মা এবার অজয়ে এসেছেন। চলুন, জলস্পর্শ করে আসা যাক। সে এক হুলুস্থুল ব্যাপার। সেই প্রচণ্ড শীতকেও উপেক্ষা করে লোকে স্নান করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল। অন্ধকার তখনো কাটেনি। তবু অন্ধকারেই লণ্ঠনের আলোয় চারিদিক থেকে লোকজন যেতে সুরু করল ঘাটের দিকে।

সাধুরা বললেন—বাবারা যেন চান করবেন না গো। শুধু একটু-খানি জলস্পর্শ করে উঠে আসুন।

—সেই ভালো। এত ভোরে, বিশেষ করে এই শীতে একবার যদি ঠাণ্ডা লেগে যায় তো অসুখ করে যাবে। তার চেয়ে জলস্পর্শ করাই ভালো। বেলায় বরং স্নান করব। রোদ্দুর উঠবে তখন। তাছাড়া যোগটাতো সারাদিনই। ভোরেই যে স্নান করতে হবে তারই বা কি মানে আছে ?

—উঠো তবে। গিয়ে একটু জল মাথায় নিয়া আসি।

আমি উঠলাম। ন্যাড়াও উঠল। দুজনে কাঁপতে কাঁপতে চললাম ঘাটের দিকে। অন্ধকারে কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না। স্রেফ আন্দাজে ভর করে দুজনে চলতে লাগলাম। ইতিমধ্যে মহান্ত বাবাদের আখড়া থেকে কীর্ত্তনের দলও বেরিয়ে পড়েছে একটা। তারাও চলেছে ঘাটের দিকে। আমরা তাদের পিছু নিয়েই ঘাটে গেলাম। তারপর অজয়ের ভাঙন বেয়ে নিচে নেমে ভিজে বালিতে পা দিয়ে কোন রকমে জলস্পর্শ করে নিয়মরক্ষা বা পুণ্যার্জ্জন দুই করলাম। মা গঙ্গা এইমাত্র অজয়ে এসেছেন। কয়েক মুহূর্ত হ'ল। অজয়ের স্রোত এখন বিপরীতে। কিন্তু অন্ধকারে স্রোত ঠিক বোঝা যাচ্ছে না কোন দিকে বইছে। তবে সে বোঝবার জন্য আলাদা লোক আছে। তারা রাত্রি দুটোর পর থেকে নদীর গর্ভে কাঠি পুঁতে ফুলের বৃন্তে সুতো বেঁধে সেই সুতো কাঠিতে জড়িয়ে জলে ভাসিয়ে রেখেছে। রেখে আলো জ্বেলে অপেক্ষা করছে কখন ফুল স্রোতের বিপরীতে যায়। তারপর যেই ফুলের বিপরীত দিকে টান পড়ল অমনি বুঝল মা এসেছেন। আগেকার দিনে নাকি ছোট খাটো একটা স্রোত জোয়ারের মতো নদীর উপর দিয়ে বয়ে যেত। স্রোতটা আসত কাটোয়া থেকে।

অজয়ের জল মাথায় নিয়ে আমরা ওপরে আসতেই এক বিরাট সন্ত-বাহিনী হুড়মুড় করে নেমে পড়ল নদীতে। এই নিদারুণ শীতে কৌপীন এঁটে খালি গায়ে সব হাবুড়ুবু খেতে লাগল নদীর জলে। হাঁটু ডোবেনা এমন জলে। চেটোটি মাত্র ডোবে। তাই সই। তাতেই পড়ে সব গড়াগড়ি দিতে লাগল।

রেকাবিতে প্রদীপ সাজিয়ে মেয়েরা এলো। সেই প্রদীপ জ্বেলে কলাব মাঞ্জাসে ভেলা সাজিয়ে নদীতে ভাসিয়ে দিল।

বাউল-বৈরাগীও এলো কত। কত এলো বৈষ্ণবী-বৈষ্ণব।

সারা জীবনের যতো পাপ সবই নাকি মোক্ষ হবে আজ। মা তো তাই এসেছেন। কালুষনাশিনি মা গঙ্গা। সকলের সকল কলুষ নাশ করতে এসেছেন আজ। ভক্ত কবির এই পুণ্যতীর্থে। চারিদিকে

নামের গুণগান। গীত গোবিন্দের শ্লোকাবৃত্তি। কদম খণ্ডীর ঘাট থেকে সুরু করে নদীর ধারে ধারে চারিদিকেই স্নানের জন্য লোকের ব্যস্ততা। হৈ হৈ রৈ রৈ চারিদিকে। মৃদঙ্গ মন্দিরার সুরে হোমক ও ডুগির দাপটে চারিদিক জমজমাট। কি আনন্দ। কি আনন্দ চারিদিকে। বড় সাধ ছিল জয়দেবের মেলা দেখব ; আজ আমার সেই সাধ পূর্ণ হ'ল। আমি ধন্য হলাম।

—বড় শীত লাগছে গ। চলো কোথাও গিয়ে একটু চা-টা খাওয়া যাক।

—চল। চা খেলে শরীরটা গরম হবে একটু। আর এই কন কনানি সহ্য হচ্ছে না।

আমরা নদীর ধার থেকে সরে এসে একটা চায়ের দোকানে গিয়ে জুটলাম। দোকানদার রাত্রি থাকতে উঠে উনুন ধরিয়ে গরম জল বসিয়েছে। আর একের পর এক খদ্দেরকে তাদের চাহিদা মতো চা দিয়ে যাচ্ছে।

ন্যাড়া বলল—আচ্ছা, থেক্যে থেক্যে মা গঙ্গা আজকের দিনে এইখানেই বা আসতে গেলেন কেন ? এর পিছনে কোন মাহাত্ম আছ্যে নিশ্চয়ই ?

—তা আছে বৈকি। শুনবি ?

—শোনাও না গ।

—মা গঙ্গা আছেন কাটোয়ায়। এখান থেকে পঞ্চবিংশ ক্রোশ দূরে। এই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে জয়দেব গঙ্গায় যেতেন স্নান করতে। পথশ্রমে খুব কষ্ট হোত তাঁর। একদিন তিনি পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে কাটোয়ায় অজয় আর গঙ্গার মিলন স্থলের বালুচরে বসে আছেন এমন সময় মা গঙ্গা প্রত্যক্ষভাবে তাঁকে দেখা দিয়ে বললেন, জয়দেব ! আর তোমাকে কষ্ট করে এখানে আসতে হবে না। আমি নিজেই তোমার স্নানের সময় প্রতিদিন উজান বেয়ে কেঁদুলিতে যাব। আর তোমার তিরোধানের পর প্রতিদিন না গিয়ে বছরে শুধুমাত্র পৌষ সংক্রান্তির দিন যাব তোমার ওখানে। এবং সেই দিন পাপী তাপী যারাই ওখানে আমার প্রতি বিশ্বাস রেখে স্নান করবে তাদের সকলকেই তোমার মহিমার গুণে আমি সর্বপাপ হতে উদ্ধার করব।

আকাশ তখন ফর্সা হয়ে গেছে। ভালভাবে না হলেও অস্পষ্টভাবে হয়েছে। আমরা দোকান থেকে বেরিয়ে এসে এদিক ওদিক ঘুরে দেখতে লাগলাম। হঠাৎ আমার নজরে পড়ল একটা গাছের গায়ে ছাপা একটা কাগজ সাঁটা আছে। তাতে লেখা আছে—'বিল্বমঙ্গল ধাম।' জয়দেব কেঁদুলি হইতে এক মাইল পশ্চিমে। আসুন! আসুন! এই অকৃত্রিম আনন্দময় তপোবনে প্রবেশ করুন।'

কাগজের লেখাটা পড়ে উৎসাহিত হয়ে উঠলাম। ন্যাড়াকে বললাম—চল। এখানে ঘুরে না বেড়িয়ে বিল্বমঙ্গলধামটা দেখে আসি চল। যাবি?

—যাবো না মানে! যাবার জন্যই তো আসা।

আমরা সাধুদের কাছে বিল্বমঙ্গলের রাস্তা জেনে নিয়ে যাত্রা সুরু করলাম। রাস্তাটা বেদনাশা আশ্রমের পাশ দিয়ে হরিজন পল্লীর ভেতর দিয়ে একেবারে পশ্চিম দিকে সোজা চলে গেছে।

আমরা সেই পথ ধরে চলতে লাগলাম।

শীতের অবছা ভোরে নিদারুণভাবে কাঁপতে কাঁপতে আমরা বিল্বমঙ্গলের পথে চললাম। ঘন কুয়াশায় চারিদিক আচ্ছন্ন। নদীর ধারে ধারে প্রশস্ত বেলা ভূমির বুক চিরে রাস্তা। একদিকে নদী। অপর দিকে বন জঙ্গল, মাঠ। চারিদিক খাঁ খাঁ করছে। জন মনুষ্যের চিহ্নমাত্র নেই। সেই জনবিরল পথে চলতে চলতে হঠাৎ একটা ছোট্ট গ্রাম নজরে পড়ল। ভাবলাম ঐখানেই বিল্বমঙ্গল ধাম। কিন্তু না। গ্রামে গিয়ে শুনলাম এ গ্রামের নাম টিকারবেতা। বিল্বমঙ্গল আরো অনেকদূর। জয়দেব থেকে বিল্বমঙ্গল তু'মাইলের বেশী হবে তবু কম নয়।

ন্যাড়ার মন খুঁৎ খুঁৎ করতে লাগল।

—পথ ঘাট জান্তি না। এভাবে যাওয়াটা কি ঠিক হোচ্ছে আমাদের ?

—চল না শেষ পর্যন্ত। তারপর দেখা যাবে কোথায় গিয়ে ঠেকি।

তুজনে চলতে লাগলাম। ধীরে নয়। দ্রুত পা চালিয়ে চলতে লাগলাম তুজনে। কিছুটা পথ যাবার পর মনে হ'ল আমরা যেন মরুভূমির ওপর দিয়ে চলেছি। এই ভাবে একবার পথ চলেছিলাম দ্বারকা থেকে সুদামাপুরীর পথে। ধনুস্কোডি আর মণিহারি ঘাটে। আজমীরে পুষ্কর হ্রদ থেকে সাবিত্রী পাহাড়ের প্রান্তদেশ পর্যন্ত। আজ আবার চলেছি। চারিদিকে শুধু বালি আর বালি। মাটির চিহ্নমাত্র নেই। পায়ের তলার মাটির পথ কখন ফুরিয়ে গেছে। ধু ধু করছে

বালি। বালির বুকে ঘন কাঁটা বন। শুকনো কাশ। বালুর বুকে গোক্ষুরের চিহ্ন। মানুষের চরণচিহ্ন।

ন্যাড়ার দিকে চেয়ে দেখলাম ওর মুখ শুকিয়ে গেছে তখন। বেশ ভয় পেয়েছে। মানুষের চিহ্ন না দেখে ঘাবড়ে গেছে বেশ। ভয় আমিও পাচ্ছিলাম। আমার ভয় অন্য কিছু নয়। চোর ডাকাতের। সঙ্গে জিনিস পত্তর এমন কিছু মূল্যবান নেই। তবে টাকা কড়ি আছে। কেউ লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লে হাজার চেঁচালেও এখানে শুনতে পাবে না কেউ।

—আর নয় দাদা, ফিরে চলো এবার। আমি ভালো বুঝছি না। পরে বরং বেলা হলে লোকজন যদি কেউ আসে তাদের সঙ্গে আসা যাবে। এখন ফিরে চলো। কথাটা যুক্তিহীন নয়। কিন্তু আমিই কি পিছপাও হবার ছেলে? যা আছে বরাতে তাই হবে। ভয়ে পেছুবো না। এতদূর এসে ফিরে যাওয়া মানে লজ্জার ব্যাপার। বললাম —ভয় কি! এতটা রাস্তা এসে ফিরে যাব? আর একটু এগিয়েই দেখি না পথের শেষ নিশ্চয়ই হবে। চল।

চল তো চল। আমরা চলতেই থাকলাম। চারিদিকে সবুজ বনানীর হৃদয় হতে ভেসে আসা পাখীদের কলতান শুনতে শুনতে পথ চলতে লাগলাম আমরা। অজয় এখানে অত্যাধিক চওড়া। নদীর জল কিন্তু বেঁকে গিয়ে ও কূল ঘেঁসে ভাঙনের কোল ছুঁয়ে কল কল করে বইছে।

ন্যাড়ার পায়ে কাঁটা বিঁধল বুঝি। উঃ করে বসে পড়ল সে। হ্যাঁ। বন কুলের কাঁটা বিঁধেছে পায়ে। চলিতে যে হায়, কাঁটা বেঁধে পায়। সেই কাঁটা পায়ে বিঁধেছে। কাঁটা তুলতে গিয়ে দু'একটা বন কুলও মুখে ফেলে দিল ন্যাড়া। মন্দ না খেতে। আমিও খেলাম।

শিশির ভেজা মাটির গন্ধ আর বন কুলের গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে আমরা পথ চলছিলাম। এমন সময় চোখে পড়ল দূরে এক ঘন বনের মধ্যে থেকে লাল শালুর একটি ধ্বজা। সেটা চোখে পড়তেই উৎসাহিত হলাম দুজনে। প্রতি মুহূর্তেই আমরা ভাবছিলাম বোধ হয় পথ ভুল করেছি আমরা। কিন্তু এবার আর কোন রকম সন্দেহ রইল না মনে। ঐ বিল্বমঙ্গল। যার উদ্দেশ্যে এত পথ এমন করে আসা। সেই ধ্বজা

লক্ষ্য করেই পথ চলতে লাগলাম আমরা। হাঁটার উৎসাহ যেন দ্বিগুণ বেড়ে গেল আমাদের। ঐ তো কাছে আরো কাছে এগিয়ে আসছে আমাদের গন্তব্যস্থল। আর কয়েক পদ গেলেই আমরা পৌঁছে যাব।

নদীর তীরে বালির চটানের পাশেই তপোবন। এই স্থানে আগে গ্রাম ছিল। নাম ছিল বেলুরিয়া। এখন গ্রাম নেই। আছে তপোবন। বিল্বমঙ্গল ধাম। কি নির্জন স্থান এখানটা। কাছে পিঠে লোকালয় নেই। শুধু মাঠ ধানক্ষেত আর বন বাদাড়।

একটি বিরাট বটগাছ তপোবনের ভিতর অনেক খানি জায়গাকে ছায়াচ্ছন্ন করে দাঁড়িয়ে আছে। গাছের নীচে মাটি দিয়ে বাঁধানো বৃহৎ বেদী। গাছের একটি ডালে ছোট একটি পিচ বোর্ডে সাদা কাগজ সেঁটে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাতে লেখা আছে 'বিল্বমঙ্গল ঠাকুর এই বটগাছের নিচে পিতৃশ্রাদ্ধ করিয়া ওপারে চিন্তামণির নিকট গিয়াছিলেন।'—লেখাটা পড়ে কেমন যেন ভাব এসে গেল। এই সেই গাছ?

বটগাছের পাশেই বাঁশ কঞ্চির বেড়ায় ঘেরা ছোট ছোট তিনখানি ঘর। মাটির ঘর। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। তক তক করছে। নিকোন মুছানো। এই হল সাধুর আশ্রম। সেই ঘরের পাশ দিয়ে রাধাকুণ্ডের গা ঘেঁসে আমরা যেখানে পৌঁছলাম সেখানে পৌঁছে বিস্ময়ের আর অবধি রইল না। চারিদিকে কত নাম না জানা গাছ। মধ্যে অনেকখানি বিস্তীর্ণ স্থান। স্থানটির মধ্যাংশে যুগল একটি তমালতরু। এই তরুর তলদেশও মাটির বেদী দিয়ে বাঁধানো। গাছটি একটি দেখবার মতো বস্তু। এর পত্রপল্লব অত্যন্ত ঘন। গাছের ডালে ডালে ফলেছে তমাল। ছোট ছোট ফল। লাল রঙ। যেগুলো কাঁচা সেগুলোর রঙ সবুজ। এই তমাল গাছের আকৃতি অনেকটা রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তির পায়েব মত বঙ্কিম। গাছটি নয় শত বৎসরের প্রাচীন। কলকাতার বৈজ্ঞানিকরা গবেষণা করে এর প্রাচীনত্ব নির্ধারণ করেছেন। এই গাছের সামনেই একটি ভাঙা ঘর। ঘরের পিছনদিকে বহু পুরাতন ইটের অবশিষ্ট দেওয়াল। একটি বটগাছের ফ্যাকড়া শিকড় আষ্টেপিষ্টে আঁকড়ে দেওয়ালটিকে ধরে রেখেছে। গাছটিকে অবলম্বন করেই এই ঘর। একদা এই ঘরেই নাকি ঠাকুর বিল্বমঙ্গল ভূমিষ্ঠ হয়ে ছিলেন।

এতক্ষণে রোদ উঠল। একফালি রোদ। মিষ্টি হাসির মতো গাছপালার ফাঁক দিয়ে এসে লুটিয়ে পড়ল আমাদের গায়ে। আমরা বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের ভিটেয় প্রণাম করলাম। প্রণাম করে উঠে দাঁড়াতেই দেখলাম এক দীর্ঘ পুরুষ দাঁড়িয়ে আছেন আমাদের সম্মুখে। সেই পুরুষাকারকে দেখে কেন জানি না চমকে উঠলাম। অনুমানে বুঝলাম ইনিই এখানকার সাধুবাবা। এই আশ্রম এনারই।

বললাম—আপনিই কি এখানকার— ?

—হ্যাঁ। অবধূত প্রেমানন্দ গোস্বামী। কোথায় বাড়ি তোমাদের ?

—আজ্ঞে আমার বাড়ি হাওড়ায়। আর এ থাকে মালদহে। জয়দেবের মেলা দেখতে এসেছিলাম। তাই আপনার এখানটাও ঘুরে যাচ্ছি।

—তোমরা কি দুজনেই এসেছ ? না আর কেউ এসেছে ?

—আমরা দুজনেই।

—কি নাম তোমাদের ?

নাম বললাম।

নাম শোনা মাত্রই চারিদিক কাঁপিয়ে হো হো করে কপালকুণ্ডলার সেই কাপালিকের মতো হেসে উঠলেন সাধুবাবা। তারপর বললেন—কেন হাসলাম বলতে পারো ?

আমি হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম। তাই জুড়নো গলায় বললাম—না।

—তোমার মাথার ঐ টুপিটা দেখে আমি তোমাকে মুসলমান মনে করেছিলাম। আবার তোমার পাশে যাকে দেখছি তাকেও উৎকলবাসী মনে হয়েছিল। যাই হোক। এবার নিঃসংশয় হলাম। তোমরা দুজনেই তাহলে ব্রাহ্মণ। তা এত ভোরে কি করে এলে তোমরা ? যাক। এসেছ বেশ করেছ। তোমাদের দেখে খুব আনন্দ হচ্ছে আমার। এই সবে নিকোন চুকোন হয়েছে। বসো।

আমরা বসলাম।

—কখন রওনা হয়েছ বাবা তোমরা ?

—ঘড়ি দেখে তো বেরোই নি। তাই ঠিক বলতে পারছি না। তবে আকাশটি যেই একটু স্বচ্ছ হয়েছে অমনি বেরিয়েছি।

—তোমার মধ্যে কবিত্ব রয়েছে দেখছি।

—কি করে বুঝলেন ?

—ঐ যে তুমি বললে 'স্বচ্ছ'। স্বচ্ছ কথাটা কি চলিত কথায় কেউ ব্যবহার করে ? করে না। একটু যারা, মানে আর কি যাদের একটু কবি কবি ভাব তারাই করে।

আমি হাসলাম। আমি যে লেখালেখির চর্চা করি সেটাই বোধ করি ফলাও করে বলতে যাচ্ছিল ন্যাড়া। তা বুঝতে পেরে সে কিছু বলবার আগেই তাকে টিপে দিলাম।

—জয়দেবে কোথায় উঠেছ তোমরা ?

—উঠিনি কোথাও। এখানে ওখানে ঘুরে বেড়িয়ে বেদনাশা আশ্রমে রাতটা কাটিয়েছি। সারারাত ঘুমোতে পারিনি। এই পর্যন্ত বলে গত রাত্রের কষ্টের কথাটা সবিস্তারে বললাম সাধুকে।

সব শুনে কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে থেকে সাধু বললেন—তোমরা ছুজনেই দেখছি ভক্ত মানুষ। না হলে এই বয়সের ছেলেরা কেউ তীর্থ করতে আসে ? আগে যদি জানতাম তাহলে এতটুকুও কষ্ট পেতে দিতাম না তোমাদের। যাক। ভগবানের কৃপায় এসে যখন পড়েছ তখন আর কোন ভাবনা নেই। আমার আশ্রমেই তোমরা থাকো। তেসরা মাঘ আমার এখানে মহোৎসব। সব দেখে শুনে চার পাঁচ তারিখ করে যাবে। কেমন ?

হালে পানি পেলে মাঝির মনের যে অবস্থা হয় ঠিক সেই অবস্থা হ'ল আমার। নিজের কানকেই যেন বিশ্বাস করতে পারলাম না। আশ্রয় ? মাথা গোঁজবার মতো একটু স্থান ? তাও এই সদাশয় সাধুর আশ্রমে ? এ যে কল্পনারও অতীত। ন্যাড়া তো লাফিয়ে উঠে একটা পেন্নামই করে বসল সাধুকে।

সাধু বললেন—থাক থাক। তারপর আমাকে বললেন—বাবা, অনেক কষ্ট করে অনেক পথ পার হয়ে তোমরা এসেছ। এবার একটু মুখ হাত ধুয়ে নাও। সামনেই কল আছে। কোন অসুবিধা হবে না। বলে সাধু নিজেই কাছের একটি নিমগাছ থেকে দাঁতন ভেঙে হাতে দিলেন।

দাঁতনটা চিবুতে চিবুতে কম্বলটা গা থেকে খুলে ফেললাম। টুপিটাও রাখলাম খুলে। তারপর বেশ করে দন্ত মার্জনা করে কলে গিয়ে মুখ হাত পা ধুয়ে নিলাম। সঙ্গে গামছা ছিল। মুছে নিতেও অসুবিধা হ'ল না।

সাধু ডাকলেন—গেনি ! গেনি !

ডাকার সঙ্গে সঙ্গেই একজন মধ্য বয়সি স্ত্রীলোক বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। এয়োস্ত্রী। কপালে সিঁথিতে ডগ ডগ করছে সিঁদুর।

—আমাকে ডাকছেন বাবা ? বলে বেরিয়ে এসে আমাদের দেখতে পেয়েই ঘোমটাটা টেনে দিলেন মাথায়।

সাধু বললেন—মা, ওরা তোমার ছেলের মতন। এখন কদিন এই আশ্রমেই থাকবে ওরা। ওদের দেখে লজ্জা পাবার কিছু নেই। ওদের জন্য চায়ের ব্যবস্থা করো। আর রামধনিকে বলো আলু তুলে দিক। আলুসেদ্ধ করে মুড়ি দিয়ে জল খেতে দাও ওদের।

গেনি হাসি মুখে চলে গেলেন আদেশ পালন করতে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম—উনি কে বাবা ?

—আমার শিষ্যা। বড় ভালো ও। বড় দুঃখি। ওর কথা যাক। তোমরা এসো, ঠাকুরের ওখানে বসিগে।

আমরা সাধুর সঙ্গে বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের ঘরের কাছে গেলাম। ঘরের ভিতর একটা কাঠের বাক্স ছিল। তার ওপর একটা ভাঁজ করা সতরঞ্চি রাখা ছিল। সাধু সেখানি ঠাকুর ঘরের চাতালে বিছিয়ে কাঠের বাক্স থেকে কয়েকটি বই বার করলেন। এই বইগুলি সাধুবাবা লিখেছেন। এবং নিজেই ছাপিয়েছেন। চটি চটি বই। কিন্তু দাম করেছেন অসম্ভব। ডিমাই সাইজের দু'ফর্মার বই। দাম এক টাকা, দেড় টাকা, কোনটা বা দুটাকা। বইগুলো গুছিয়ে রাখলেন সাধুবাবা। বললেন—এই বই লিখেছি। মেলায় যাত্রীরা এলে কেউ যদি কেনে তো কিনবে। বেশী দামও নয়, মাত্র এক দেড় টাকা। কিন্তু ছাপাতে কি আমার কম খরচ হয়েছে ?

দামের সমালোচনাটা আমি আর করলাম না। কি হবে অপ্রিয়ভাজন হয়ে ?

সাধু বললেন—আমার কথা যাক। বনে বাস করি। জপ তপ করি। কয়েকটা বই লিখে ফেলেছি। এবার তোমার কথা বলো। কাজকর্ম কি করা হয় ?

বললাম—স্থায়িভাবে তো কিছুই করি না। মাঝে মধ্যে যখন যেখানে পারি ঢুকে পড়ি।

—তারপর ?

—ঘুরে ঘুরে বেড়াই।

—বাঃ বাঃ, বেশ। বিয়ে থা হয়েছে?

—না।

—ভাইবোন কটি? মা বাবা আছেন?

বললাম। সমস্ত পরিচয় অকপটে দিলাম।

ন্যাড়া বলল—একটা কথা বলব বাবা?

—বলো বলো?

—এমন চমৎকার জায়গায় আপনি থাকেন, তা এক্ষানে কোন কোন মন্দির-টন্দির প্রতিষ্ঠা করেননি কেন? তীর্থের মতো হয়ে যেত। দলে দলে যাত্রী আসত।

—মন্দির করতে অনেক খরচ। আমি বনবাসী সাধু। অত টাকা কোথায় পাব বাবা?

—যদি কেউ দেয়?

সাধুর চোখের মণি দুটো নেচে উঠল—সে রকম কেউ আছে নাকি?

—ধরুন, যদি আমিই দিই।

—তুমি! তুমি কোথায় পাবে অত টাকা?

—আপনি মন্দির তৈরীর ব্যবস্থা করুন। যা লাগে, যতো টাকা লাগে সব আমি দুবেো। আপনার আশীর্বাদে আমার টাকার অভাব নাই। বাবা যা রেখে গেছেন তা যথেষ্টই। তার ওপর আমের ব্যবসা আছে আমাদের। টাকার জন্য আটকাবে না।

আনন্দের আবেগে সাধুর গলা দিয়ে প্রথমে তো কথাই সরল না। তারপর উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন—যা বলছ তা সত্যি? সত্যি বলছ তুমি আমার এখানে মন্দির প্রতিষ্ঠা করে দেবে? সে সৌভাগ্য হবে আমার ঠাকুরের? আমার বড় সাধ বাবা একটা মন্দির বানাব। তোমার যখন সামর্থ্য আছে তখন গরীব সন্ন্যাসীর এই উপকারটুকু করো বাবা। ভগবান তোমার মঙ্গল করবেন।

—আপনি অধীর হবেন না। আমি কথা দিলাম! সত্যবন্দী হলাম। আমার গুরুর দিব্যি দেওয়া রইল। আপনার এখানে মন্দির আমি করবই।

সাধু আনন্দের আবেগে আমাদের দুজনকে জড়িয়ে ধরলেন তাঁর বুকে। বললেন—জানি না কে বাবা তোমরা। মানুষ কি দেবতা

তাও জানি না। কি ছলে আমায় ছলনা করতে এসেছ তা কে জানে। এমন অসময়ে এই এত ভোরে আজ পর্যন্ত আমার এখানে কেউ আসে নি। তোমরা হয়তো ঈশ্বরের কৃপাতেই এসে পড়েছ। তোমাদের দিয়েই হয়তো আমার এতদিনের স্বপ্ন সফল হবে। তোমাদের জয় হোক। বলেই তিনি পাগলের মতো ছুটে চললেন ঘরের দিকে। চিৎকার করে ডাকতে লাগলেন—ওরে শুনে যা। গেনি, গেনি!

সাধুবাবার ডাক শুনে গেনি বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে।

—ওরে! শোন, শোন, আমার ঠাকুর আজ আমার কাছে কাদের পাঠিয়ে দিয়েছেন দেখ। আমার এত দিনের আশা এবার সফল হবে। এই ছেলেটি। বলে হাত দিয়ে ন্যাড়াকে দেখিয়ে বললেন—এই ছেলেটি আমাদের এখানে মন্দির প্রতিষ্ঠা করে দেবে।

গেনিও শুনে আনন্দিত হলেন। বললেন—সত্যি! সত্যি বলছে ও? কিন্তু অত টাকা?

গেনির বিস্ময়কে প্রশস্ত হতে না দিয়েই বলে উঠলেন সাধুবাবা—ওরে! ওর কি টাকার অভাব আছে রে? ও বিরাট বড় লোকের ছেলে। মালদহের লোক। আমের ব্যবসা করে। ও ইচ্ছে করলে একটা ছেড়ে দশটা মন্দির বানিয়ে দিতে পারে এখানে।

সাধুবাবা যতই উচ্ছসিত হচ্ছিলেন আমি মনে মনে ততই ভয় পাচ্ছিলাম। কেননা ন্যাড়াকে আমি ঠিক বিশ্বাস করি না। আবার অবিশ্বাসও করি না। ন্যাড়া বলে চলল—আপনার এক্ষানে মন্দির আমি করব—করব—করব। আমি ওঙ্কারনাথের শিষ্য। আমার কথার খেলাপ হব্যে না। তীর্থ ভ্রমণ, তীর্থে মন্দির নির্মাণ এবং দরিদ্র ব্রাহ্মণ কন্যার বিবাহ দান, এই তিনটি কর্ম আমাকে করতেই হবে। এ আমার গুরুর আদেশ। এতে যদি আমায় পথের ভিখারি হতে হয় সেও ভালো।

গরম ডালে ঘি পড়লে যেমন হয় ঠিক সেই রকম হ'ল। সাধুবাবা গলে গেলেন একেবারে—বাঃ বাঃ বাঃ! চমৎকার। জয় হোক। জয় হোক। জয় বিল্বমঙ্গল। ওরে গেনি, ভগবান এবার আমাদের প্রতি সত্যই সদয় হয়েছেন রে। শোন, শোন, ছেলের কথাটা শোন একবার। বলেই ডাকলেন—কুন্তলা! কুন্তলা!

—কুন্তলা মাঠে গেছে বাবা। কপিলাকে বাঁধতে গেছে।

সাধু অমনি দ্রুত পায়ে মাঠের দিকে চললেন। তারপর নিমেষের মধ্যে যাকে ধরে নিয়ে এলেন আমাদের সামনে, তার দিকে চাওয়া মাত্র আমি স্তব্ধ হয়ে গেলাম। আমার মনে হ'ল আমি যেন স্বপ্ন দেখছি। এই বন রাজ্যে নদীতীরে নির্জন তপোবনে এ কোথায় এসে পৌঁছলাম আজ? তার দিকে তাকিয়ে চোখের পাতা ফেলতেও ভুলে গেলাম।

—এই দেখো। এই আমার মা। তুমি বললে না যে, দরিদ্র ব্রাহ্মণ কন্যার বিয়ে দেবে? এই দেখো, কন্যা তোমাদের সামনেই দাঁড়িয়ে। এরও একটা গতি করে দাও বাবা। আমি বনবাসী সাধু। ভেবে ভেবে কুল পাচ্ছিলাম না। এমন সময় তোমরা এলে। এ সবই ঠাকুরের যোগাযোগ। তোমরা দেবদূত। তোমাদের যে আমি কি বলে আশীর্বাদ করব তা ভেবে পাচ্ছি না। তোমরা আমাকে অনুগ্রহ করো।

আমার মতো ন্যাড়াও খুব থতিয়ে গেছে তখন। সেও হাঁ করে চেয়ে আছে কুন্তলার দিকে। তার অতুলনীয় রূপ রাশির দিকে। আমিও চেয়ে আছি। শুধু চেয়ে আছি নয় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছি তার চোখ মুখের গড়ন, গায়ের রঙ। রূপ যেন ফেটে পড়ছে। পনেরো ষোলো বছরের মেয়ে। যৌবন উপচে পড়ছে শরীর বেয়ে। একটা ছাপা শাড়িকে পেঁচিয়ে পরেছে শুধু। তাতেই তাকে অপরূপ দেখাচ্ছে। সে ভয়ে ভয়ে একবার আমার দিকে তাকাল। তারপর চোখ নামিয়ে চেয়ে রইল নিজের পায়ের আঙুলের দিকে। নখ দিয়ে মাটিতে রেখা টানতে লাগল নিজ মনে। তার পায়ের আলতার রঙ প্রতিমার পায়ের মতো মনে হচ্ছিল। যেন দুর্গা প্রতিমাটি কেউ রক্ত মাংসে গড়েছে। আমি মুগ্ধ চোখে তার পায়ের দিকে তাকালাম। এই মুহূর্তে এই পরিবেশে তাকে দেখে আমার অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ মনে পড়ল। মনে পড়ল শকুন্তলার কথা। তাতে আর এতে তফাৎ কই? শকুন্তলাকে দেখিনি। কিন্তু কুন্তলাকে দেখেই শকুন্তলাকে দেখা হয়ে গেল। সাধুকে দেখে মনে হ'ল কণ্বমুনির কথা। আর গেনি যেন মা গৌতমী।

আমরা সকলে যেখানে জমা হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম সেখানে আর এক জনের আবির্ভাব হ'ল। গ্যাঁটাগোঁট্টা এক বিহারি মুনিষ। তার হাতে একটা কোদাল। কোঁচড়ে এক কোঁচড় কি যেন। সে এসে বলল—আলুগুলো কোথায় রাখব মাজী?

গেনি বললেন—রান্না ঘরে রাখো। বলে ঘরে চলে গেলেন।

কুন্তলাও আমার দিকে একবার চোখ বুলিয়ে ঘরে চলে গেল।

সাধু বললেন—রামধনি! তুই বালতি দুটো ভরে দে। আমরা ঠাকুরের ওখানে আছি। চা হলে ডাকবি। বুঝলি?

রামধনি আলুগুলো রান্নাঘরে রেখে এসে হাসতে হাসতে বলল—আপ্‌নের আলু খুব ভালো হইছে সাধুবাবা। গেনি মাজী খুশি হইছে খুব। বলে আমাদের দিকে চেয়ে হেসে জলের বালতি নিয়ে কলতলায় গেল।

সাধুর সঙ্গে আমরা গেলাম ঠাকুর তলায়। সাধু সেখান থেকে আর একবার হাঁকলেন—রামধনি!

—যাতে হেঁ।

রামধনি ছুটতে ছুটতেই এলো প্রায়। বলল—বলুন।

—এদের এই মাল পত্তরগুলো ঘরে রেখে আয়। এরা আজ থেকে-এখানেই থাকবে।

রামধনি হুকুম তামিল করল।

সাধু বললেন—জয় ভগবান।

এমন সময় আলকাৎরার মতো কালো সাদা থান পরিহিতা দুজন স্ত্রীলোককে আমাদের দিকে আসতে দেখলাম। সাধু হঠাৎ তাদের দেখতে পেয়ে গম্ভীর হয়ে গেলেন।

যারা এলো তারা কর্কশ গলায় বলল—এই যে, তোমার কাছেই আসছি। বলি, তোমার মতলব খানা কি. শুনি? সাধু সেজে জটা ধারী হয়ে ভালো মানুষের মতো বসে আছো, আর পরের বউ-ঝির সর্বনাশ করছ। বলি তোমার ব্যাপার খানা কি?

গরম তেলে জলের ফোঁটা পড়লে যেমন হয় ঠিক সেই রকম হ'ল। সাধু লাফিয়ে উঠলেন—তার মানে?

—তার মানে? তার মানে তোমার মুখে মুড়ো ঝ্যাটা। গেনিকে তুমি ছাড়বে, না ছাড়বে না? একটা কথা বলো। আমরা ওকে নিয়ে যেতে এসেছি। হয় ওকে ভালোয় ভালোয় ছেড়ে দাও, না হলে কিন্তু কেলেঙ্কারির শেষ থাকবে না, এই বলে দিলুম।

—ওকে তো আমি ধরে রাখিনি। ওর যদি যেতে ইচ্ছে হয় তো চলে যাক।

—সে উপায় কি তুমি রেখেছ মুখপোড়া মিনসে। চরিত্রহীন। চরিত্র খুইয়ে সাধু সেজে বনের ভেতর বসে রাসলীলা করছ। ভণ্ড কোথাকার। তোমাকে কে চেনে না? এখনো সময় আছে। হয় ওকে ছেড়ে দাও, না হলে গুণ্ডা এনে ঠেঙিয়ে যাবো। সাধুগিরি করছ, দেখে শুনে ভৈরবী নিয়ে এসো। পরের ঘরের বউয়ের দিকে নজর কেন?

সাধু তখন ভয়ানক ক্ষেপে উঠেছেন। ঘরের ভিতর লম্বা একটা ত্রিশূল ছিল। সেটা হাতে নিয়ে চতালের ওপর থেকে এক লাফে রঙ্গমঞ্চে নেমে দাঁড়ালেন—খবরদার। খবরদার বলছি। আর একটা খারাপ কথা মুখে আনলে খুন করে ফেলব। ক্ষমতা থাকে তো নিয়ে যা তোদের বউ। আমি ছেড়ে দিচ্ছি। যা নিয়ে যা। গেনি! এই গেনি!

গেনি কাঁদতে কাঁদতে সেখানে আলুথালু বেশে ছুটে এলেন। কুন্তলাও এলো পিছু পিছু। সাধু ধমক দিলেন—তোকে কে আসতে বলল? যা ঘরে যা তুই।

গেনি বলল—ক্ষ্যান্ত হন বাবা। আপনি চুপ করে বসে থাকুন। ওদের কথায় একদম কান দেবেন না। ওদের যার যা ইচ্ছে সে তাই বলুক। একবার যখন সে ভিটে ছেড়ে এসেছি আর আমি সেখানে ফিরে যাব না। কি হবে আমার সোনাদানায়? কি হবে আমার স্বামীপুত্রে? আমি যা চেয়েছি তার থেকেও অনেক বেশি পেয়েছি। এই শান্তির জায়গা ছেড়ে আমি আর কোথাও যাব না।

—ওদের স্পর্ধা দেখ। বলে কিনা আমি নাকি লোকের বউ মেয়ের সর্বনাশ করি।

স্ত্রীলোক দুটি অমনি ঝাঁঝিয়ে উঠল—করিসই তো। বশীকরণ করে ঘরের বউকে বাইরে টেনে আনিস। তা কেউ জানে না ভেবেছিস? এর আগের বউটাকে গলায় ফাঁস লাগিয়ে মেরেছিলি। এটাকেও কি দু' দিন বাদে তাই করতে চাস?

—ও আমাকে বাবা বলে। ও আমার মেয়ের মতো।

—মুখে পোকা পড়বে রে, পোকা পড়বে। ওসব চালাকি রেখে দে। দিনের বেলা বাপ বেটি, রেতের বেলা মাগ ভাতার। ডুবে ডুবে জল খাস শিবের বাবাও টের পায় না ভেবেছিস, না? ওষুধ করে বশীকরণ করে বউটাকে ভেড়া বানিয়ে নিয়ে এসেছিস। বড় ঘরের বউ। সোনাদানায় মুড়ে রেখেছিল ওর স্বামী। চার ছেলের মা। তারা লজ্জায় পরিচয় দিতে পারে না লোকের কাছে। ছিঃ ছিঃ। স্বামীটা পাগল হয়ে গেছে বউটার জন্যে তা জানিস? বলেই গেনির হাত ধরে টান দিল তারা।

গেনি বললেন—কেন মিছিমিছি হায়রান হতে এসেছ তোমরা? আজ দশ বছর আমি ঘর ছেড়েছি। ঘরের মায়া আর নেই। আমার স্বামী, আমার পেটের ছেলেরা যখন খোঁজ খবর রাখে না তখন আমি কাদের জন্য সেখানে ফিরে যাব?

—কি করে খোঁজ খবর নেবে বল? সে মুখ্ কি রেখে'ছিস তুই? তোর মত সতী সাধ্বী মেয়ের কিনা শেষে এই কাজ? অবিশ্যি তোর দোষ আমরা দিই না। তুই কি আর সে তুই আছিস?

সাধু বললেন—আমি ভগবানের নামে শপথ নিয়ে বলছি ওর সঙ্গে কোন রকম খারাপ সম্পর্ক আমার নেই। ওর স্বামী মাতাল। মদ খেয়ে ওকে নির্যাতন করত। তাই মনের দুঃখে বৃন্দাবনে গিয়ে ব্রজবাসী হয়েছিল সে। আমি অনেক করে বুঝিয়ে ওকে ঘরে ফিরিয়ে ছিলাম। কিন্তু তাতেও যখন দেখলাম কিছু হ'ল না তখনই আমি ওকে এনে আমার কাছে রেখেছি। আমার শিষ্যাও ও নয়। আমার কেউ নয়। আমাকে বাবা বলে। আমার কাছে থাকে। ওর স্বামী এসে আমার পায়ে নাকখৎ দিয়ে যদি কোনদিন তার কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা করে, সেদিন আমি হাসতে হাসতে তার বউ তার হাতে ফিরিয়ে দেবো। তোরা কে রে? দূর হয়ে যা এখান থেকে। তোরা ওর আত্মীয়, যে তোদের ভরসায় ছেড়ে দেবো ওকে? তোরা তো প্রতিবেশী। যেমন আছিস তেমনি থাকবি। কই, এত যদি দরদ তো এতদিন আসিসনি কেন? মেলা দেখতে এসে মুখের সুখ করতে এসেছিস, না? কদর দেখাতে এসেছিস? এক ঢিলে দু' পাখি মারতে

চাস হারামজাদীরা? দূর হ। দূর হ এখান থেকে। আর এক মুহূর্ত এখানে দাঁড়ালে শূলে করে খুঁচিয়ে মারব।

সাধুর মূর্তী দেখে আর তাঁকে ঘাঁটাতে সাহস করল না স্ত্রীলোক দুটি। নিজেদের মধ্যে কি সব বলতে বলতে পালিয়ে গেল।

সাধু ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগলেন।

গেনি বললেন—খাঁচার পাখি একবার খাঁচা থেকে ছাড়া পেলে আর কি সে খাঁচার মধ্যে ফিরে যায় বাবা? তা ছাড়া সাধু সঙ্গে একবার এলে আর ফিরতে নেই। কত দুঃখে যে আমি এখানে এসে বাবার চরণতলে পড়ে আছি তা তোমরা কি করে জানবে? কত লাঞ্ছনা, কত গঞ্জনা, কত অপবাদ যে আমি সহ্য করেছি তার ঠিক নেই। আর আমি এখন থেকে কোথাও যাবো না। বাবাকে ছেড়ে আর কোথাও যাবো না আমি। সে আমার স্বামীই আসুক আর পুত্ররাই আসুক। আর আমি ফিরছি না। এই আমার নাকে কানে খৎ। বলে হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগলেন।

সাধু বললেন—এই মানুষ জাতটা বড় ভয়ানক জাত বাবা। বনে এসেও নিস্তার নেই এদের হাত থেকে। এরা যেচে এসে ছুবলে যাবে।

আমার কাছে সব যেন কেমন গোলমাল হয়ে গেল। সাধু বললেন—কিছুদিন আগে আমার এখানে একটা খুন পর্যন্ত হয়ে গেছে।

—খুন! চমকে উঠলাম আমি।

—হ্যাঁ। আমার সাঁওতাল মুনিষটাকে এখানে এই মন্দিরের সামনে এক কোপে দিয়ে গেল শেষ করে। আমাকেও আধ মরা করে রেখে গেল। এই তো কিছুদিন হ'ল আমি হাসপাতাল থেকে এসেছি। এখনও আমি দুর্বল।

আমি অবাক হয়ে বললাম—হঠাৎ এ রকমের মানে?

—সে সব কথা থাক বাবা। কি করবে শুনে? যাই হোক। অনেকে হয়তো ভাঙচি দিতে পারে। ও সব কথায় কান দিও না যেন। এখানে কারো সঙ্গে কথা বলো না।

আমি ঘাড় হেঁট করে সব শুনে গেলাম। এখানে এই পরিবেশে রাত কাটানো যে মোটেই নিরাপদ নয় তা বেশ বুঝতে পারলাম। হায় ভগবান। শেষকালে কোন খপ্পরে এসে পড়লাম? এখানে

একটা ছেড়ে দশটা খুন হলেও জানতে পারবে না কেউ। এখানে যে কি করে রাত্রিবাস করব তাই ভাবতে লাগলাম। অথচ এখন না-ও করা যায় না। আমাদের মাল পত্তরও সাধু ঘরে নিয়ে ঢুকিয়েছেন। মহা মুস্কিলের ব্যাপার।

ন্যাড়ার চোখও তখন কপালে উঠে গেছে।

দূর থেকে রামধনি ডাকল—বাবা ওনাদের পাঠিয়ে দিন। খেতে দেওয়া হয়েছে।

সাধু বললেন—এসো, বাবা এসো। জল খাবে এসো। আমি অত্যন্ত লজ্জিত, তোমাদের সামনে এই সব ঘটে গেল বলে। কিছু মনে কোর না। তবে মানুষ জাতটাকে চিনে রাখো।

গেনি চোখের জল মুছে গলায় আঁচল দিয়ে প্রণাম করলেন ঠাকুর ঘরের চাতালে। তারপর সাধু বাবাকেও প্রণাম করলেন গলবস্ত্র হয়ে।

আমরা আশ্রমের দাওয়ায় গিয়ে বসলাম। রামধনি আমাদের বসবার জন্যে আসন পেতে দিল। আর কুন্তলা ছুটে৷ কাঁসার কানা উঁচু থালায় করে মুড়ি আর রাঙালু সেদ্ধ নিয়ে এলো। বলল—চা বানিয়েছি। আমাদের এখানে চিনি পাওয়া যায় না। গুড়ের চা। খাবেন তো?

বললাম—গুড়ের চা খেতে কোন আপত্তি নেই। তবে আমাদের কাছে কিন্তু কিলোখানেকের মতো চিনি আছে। নেবে?

চিনির নাম শুনে আনন্দে উপচে পড়ল কুন্তলা।

—চিনি আছে আপনাদের কাছে? নিশ্চয়ই নেবো। ওঃ কতদিন যে চিনি দিয়ে চা খাই নি। বাবাও খুব চিনি দিয়ে চা খেতে ভালোবাসেন।

—আমাদের মাল পত্তরগুলো তো বাবা ঘরের ভেতর রেখেছেন।

—কিসে আছে বলুন না, আমি বার করে আনছি।

—একটা ঝোলা ব্যাগের ভেতর গামছায় বাঁধা ঠোঙাতে আছে।

কুন্তলা হরিণীর মতো চেয়ে চকিতে ঘরের মধ্য থেকে গামছায় বাঁধা

চিনির ঠোঙাটা নিয়ে এলো। তারপর প্রসন্ন মনে আমার সামনেই খুলল সেটা।

বললাম—সবটাই রেখে দাও তুমি। আমাদের আর লাগবে না।

সাধুও তখন এসে দাঁড়িয়েছেন—ওরে বাবা! তোমরা চিনিটা পর্যন্ত বেঁধে এনেছো?

—হ্যাঁ। না হলে খাবো কি? বাইরে বেরোলে চিড়ে আর চিনিই আমার খাদ্য। তা চিড়েটা ইচ্ছে করে আনি নি, এখানে কিনতে পাবো বলে। চিনিটা তো পাবো না। তাই এনেছি।

—জয় হোক বাবা। জয় হোক তোমাদের। ঠাকুর তোমাদের মঙ্গল করুন। কতদিন যে চিনি দিয়ে চা খাই নি। মাঝে মাঝে বোলপুরে দুর্গাপুরে যাই। কত খোঁজ করি কিন্তু কোথাও পাই না চিনি। রেশন ছাড়া চিনি পাবার কোন উপায় নেই।

গেনি এসে বললেন—খেতে বসেছ বাবা। খাও। কে বাবা তোমরা তা তো জানি না। কুন্তলা চা করছে বুঝি? তোমরা খাও। আর মুড়ি লাগে তো বোলো। এ ছাড়া তো আর কিছু দেবার নেই বাবা। গরীব মানুষ আমরা।

গেনি একটু সরষের তেল এনে দিলেন। তাই দিয়ে মুড়ি মেখে পরম তৃপ্তির সঙ্গে আমরা রাঙালু সেদ্ধগুলোকে উদ্ধার করতে লাগলাম। দম ভোর খাওয়া হ'ল। কুন্তলা চা দিলে চা খেয়ে আমরা বললাম—এবার তাহলে উঠি বাবা? জয়দেব থেকে ঘুরে আসি। আজ তো মহোৎসব। খাওয়া দাওয়া ওখানেই সেরে নেবো। সেই সন্ধ্যে নাগাদ ফিরে আসব এখানে। কেমন?

সাধু হাঁ হাঁ করে উঠলেন—না বাবা। না। তোমরা ঘুরে বেড়িয়ে চলে এসো। এখানেই খাবে। গেনি ভাতের চাল নেবে তোমাদের। তাছাড়া এখন যাবারই বা দরকার কি? এখানেই চান টান করে নাও না। কল রয়েছে। এখানেই ঘোরো, বেড়াও।

বললাম—এখানে বেড়ানো আর গেছে কোথায়? তবে জয়দেবের মেলার জন্যেই তো এখানে আসা। তা সেই মেলাটাই যদি ভালো করে না দেখলাম—। তাছাড়া আজ মকর যোগ। কদমখণ্ডীর ঘাটে মনের আনন্দে স্নান করব। এ আমার আনক দিনের সাধ।

সাধু বললেন—সে তো বটেই। যাও, স্নান করে ঘুরে বেড়িয়ে এসো। তবে বাবা খাওয়া দাওয়া এখানেই করতে হবে কিন্তু। আমার ক্ষুদ কুঁড়ো যা আছে তাই আনন্দ করে খেতে হবে। পারবে না?

—সাধুর আশ্রমে সেবা করব, সে তো আমাদের পরম সৌভাগ্য। পারব না মানে? বলে সাধুকে প্রণাম করে আশ্রম থেকে বেরিয়ে এলাম আমরা। সঙ্গে ঝোলা ব্যাগে আয়না চিরুনি গামছা ইত্যাদি নিলাম। সাধুবাবার শোবার ঘরে ঘড়ি ছিল। তাইতে দেখে নিলাম বেলা তখন আটটা বেজে পনেরো মিনিট।

আশ্রমের বাইরে আসতেই শুনতে পেলাম অতি অপূর্ব ভাঙা গলায় বিলম্বিত লয়ে এক চমৎকার গানের সুর। গানের তালে তালে খঞ্জনি বাজছে। কি অপূর্ব সেই গান। গানের সুরের মধ্যে বুঝি যাদু ছিল। তাই শোনামাত্রই বিভোর হয়ে গেলাম। মানুষের গলায় যে এত দরদ থাকতে পারে তা আমার জানা ছিল না। সে দরদের উপমা নেই। না শুনলে তার রস অন্তরে অনুভব করা যাবে না। গানের সুরে আমি বিভোর হয়ে গেলাম। তন্ময় হয়ে গেলাম। স্তব্ধ হয়ে গেলাম। হারিয়ে গেলাম।

চেয়ে দেখলাম আশ্রমের অনতিদূরে জনমানবহীন পথের ধারে ফরসা এক ফালি কাপড় বিছিয়ে কৃষ্ণবর্ণ, শীর্ণকায়, নাতি দীর্ঘ এক বৃদ্ধ খঞ্জনি বাজিয়ে নেচে নেচে গানের তালে হেলে দুলে গাইছে—

বেল্বিমঙ্গল চিন্তামণির জয়
বল ভক্ত চয়,
বেল্বিমঙ্গল চিন্তামণির জয়—

ন্যাড়াকে বললাম—একটু দাঁড়া। গানটা শুনি। কি অপূর্ব গান রে!

আমরা দুজনেই দাঁড়ালাম। শুধু দাঁড়ালাম না, গানের সুরে এমন মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম যে মাটিতেই ঘাসের ওপর উপু হয়ে বসে পড়লাম। আমার চোখে যেন জল এসে গেল। সত্যি বলতে কি, সে গানের ছন্দ বা মর্ম এমন কিছু নয় যে একেবারে চোখে জল এসে যাবে। কিন্তু তার সুর বা পরিবেশনের সেই ভঙ্গিমা এত চমৎকার

যে মুগ্ধ না হয়ে আমি থাকতে পারলাম না। আমি মুগ্ধ চিত্তে অপলকে চেয়ে রইলাম তার দিকে। পকেট থেকে কয়েকটা পয়সা বার করে ওকে দিলাম। সেগুলো পেয়ে বৃদ্ধের বুঝি আনন্দ হ'ল খুব। সে আবেগের বশে এক মুখ হাসি হেসে আরো দরদ দিয়ে গাইল—

এমন রসিক প্রেমিক সাধক
ভক্ত ভবে আর কি হয়
বেল্বিমঙ্গল চিন্তামণির জয়—

প্রত্যেকটি কথা কেটে কেটে দরদ দিয়ে এমন করে গাইতে আমি কাউকে শুনিনি। পরিবেশের গুণেই কি না কে জানে, এ গান শুনে যে ভালো আমার লেগেছে তা আমরণ আমার বুকে বেঁচে থাকবে। কি অপূর্ব ভাব—

এমন রসিক নব রসিকের মধ্যমণি
আমাদের এই ঠাকুর বেল্বিমঙ্গল
আর চিন্তামণি—

—ঠাকুর বেল্বিমঙ্গল নব রসিকের একজন। বুয়েচ না; প্রেমিক ঠাকুর। হৃদয়ে তাঁর প্রেমের বান।

হৃদি প্রেমের সাগরে
বান ডাকিলে জোরে
হয় খান খান অজয়ের বান
প্রেমের জোয়ারে—

গানের সুর সেই নিস্তব্ধ প্রান্তরে দূরে দূরান্তরে ছড়িয়ে পড়ল। অজয়ের জলে তার কল্লোল বাজল কিনা বলতে পারব না। তবে আমার হৃদয়ে বাজছে সেই সুর। সেই গান আজও বাজছে আমার কানে—

সে কি অপূর্ব টান। টান টেনে গায়ক সোমে ফিরে না এসেই বললে—কখনো প্রেম করেছ বাবা? যদি করে থাকো তবে এর রস পাবে। নাহলে পাবে না।

ওগো এই রসের রসিক যে জন
বোঝে সে জন
আরসিকের সাধ্য নয়,
বেল্বিমঙ্গল চিন্তামণির জয়।

গান শেষ হলে আমরা বিদায় নিলাম। একটা গান শেষ করে আর একটা গান ধরল গায়ক। সেই গানের সুর শুনতে শুনতে আমরা পথ চলতে লাগলাম। এই পথ। এই পথের প্রতি ধুলিকণায় মিশে আছে বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের পদরেণু। হয়তো মিশে আছে, নয়তো ধুয়ে গেছে কালান্তরে অজয়ের বানে। পথ তবু আছে। সেই পথের ধুলি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ডগায় করে কপালে ঠেকিয়ে আমরা চলতে লাগলাম। আর শুনতে লাগলাম দূরাগত সেই গানের ধ্বনি। গান। পাখিদের কলতান এবং প্রভাতের নতুন সূর্য আমাকে যেন নতুন জীবনে নিয়ে এলো।

আমরা পথ চলেছি। চলতে চলতে পথ শেষ হয়ে এলো। সেই বনভূমি আর বালির চটান পার হয়ে আমরা আবার ফিরে এলাম জয়দেবে। দূর হতেই মেলার কোলাহল আমরা শুনতে পাচ্ছিলাম। কাছে আসতে স্পষ্ট হয়ে গেল। মেলায় গিয়ে মেলার ভিড়ে হারিয়ে গেলাম। দারুণ জমে উঠেছে মেলা। আউল বাউল সাঁই আর দরবেশীর মেলা। কত মানুষ আর অমানুষের মেলা। এই মেলা যেন মহামানুষের মহামিলনের মহামেলা। লক্ষ লক্ষ মানুষ। মানুষের পর মানুষ। যার সংখ্যা নেই। আকাশের তারার চেয়েও অগুণতি সেই মানুষেরা।

বেদনাশা আশ্রমের সামনে সেই মানুষের ভিড় যেন দলা পাকিয়ে দানা বেঁধে গেছে। ফকির আর বাউলদের গানের গমকে মেলার কোলাহল ছাপিয়ে অন্তরের আকুতির সেই নিবেদন শোনবার জন্য ভিড় ঠেলে এগোতে লাগলাম। এ বিষয়ে ন্যাড়া বেশ চৌকস। সেই ধরতে গেলে ভিড় কাটিয়ে একেবারে সামনেটায় নিয়ে গেল আমাকে। যেখানে গান হচ্ছে সেখানে একটি উচ্চস্থানে গদীতে বসে আছেন মনোহর ক্ষ্যাপা। দিব্যি দশাসই চেহারা। টক টক করছে গায়ের রঙ। দামী শাল গা-ময় জড়িয়ে বসে আছেন। কপালে তিলক। দুপাশ থেকে দুজন সুন্দরী মহিলা তাঁকে পাখার বাতাস করছেন। এই শীতেও মানুষের গরমে গায়ে যেন ঘাম ছুটছে।

একজন বলল—প্রেমের অবতার।

আর একজন বলল—ব্যাটা ভণ্ড।

মনোহর ক্ষ্যাপার গদীর নিচে মাইকের সামনে এক বাউল গান ধরেছে নেচে নেচে। বাউলের চেহারাটি বেশ। লম্বা, রোগা,

চাপদাড়ি। মাথায় পাগড়ি। শরীরের সমস্ত শক্তি যেন কণ্ঠে এনে সে উচ্চস্বরে গাইছে—

ভোলা মন সদাই করো কুমন্ত্রণা
চিনিলিনা পরম তত্ত্ব বিষয় মত্ত
সাদাই করো ভাবনা।
এসে এই ভবের হাটে গেলি তুই বেগার খেটে
হলি তুই নগদা মুটে
ওরে আমার মন
কেন কও আপন আপন—

গান শোনার ফাঁকে ফাঁকেই আমরা একটু জায়গা করে নিলাম বসবার। কেননা গানের আসর এমন জমে উঠেছিল যে সেখান থেকে যেতে ইচ্ছে করছিল না। বাউল তখন নেচে নেচে বাঁহাতে ডুগি চাপড়ে আর সপ্তমে গলা চড়িয়ে ধরেছে—

এ যে সেই নিশার স্বপন
বুঝে দেখ ও ভোলা মন
আপন তো কেউ হবে না।

গান শেষ করে সে বসতে না বসতেই উঠে দাঁড়াল আর একজন। আজকের দিনে এখানে সঙ্গীত পরিবেশন করবার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে বাউলরা। সবাইকেই তো সুযোগ দিতে হবে। তাই একজনের একখানি কি দু'খানির বেশী গাওয়া সম্ভব নয়। গান আরম্ভ হ'ল—

ও সজনি আমি কেন বা গেলাম
সুরধনির কূলে,
দেখলাম কি অপরূপ মনোহর রূপ
নয়ন গেছে ভুলে।

একটি কলি শোনা মাত্রই বাহবা দিয়ে উঠল সকলে। বাউলের মনে আনন্দ যেন উথলে উঠল। সুর বিস্তারের সফলতায় সানন্দে সে গাইল—

স্বর্ণকুম্ভ কক্ষে ধরি
আমি আনতে গেলাম গঙ্গাবারি
ও সহচরী,

ঘাটে না যেতে ভরিল কলসী দু'নয়নের জলে,
দেখবি যদি আয় গো তোরা
অতি নির্জনে গঠেছে বিধি সে গুণনিধি—

এমন সময় আলখাল্লা পরা একতারা হাতে মোষের মতো মুসকো ঘন কৃষ্ণবর্ণ একজনের আবির্ভাব হ'ল। কপালে তিলক। মাথায় নামাবলির পাগড়ি। আসরে এসেই ভাবে বিভোর হয়ে শূন্যে দুহাত তুলে সে চেঁচিয়ে উঠল—গৌর প্রেমানন্দে প্রেমসে কহো। হরি হরি বো-ও-ল।

তাকে দেখেই মনোহর ক্ষ্যাপা উল্লাসে লাফিয়ে উঠলেন—আরে এসো, এসো। বিরিঞ্চি এসো। বলি ব্যাপার কি? এত দেরি যে! আমি তো এই একটু আগে তোমার কথাই ভাবছিলাম। যে, বিরিঞ্চি এলো না কেন?

যে বাউল গান গাইছিল তার নাম শ্রীদাম। মনোহর ক্ষ্যাপা তাকে বললেন—তুমি বসো শ্রীদাম। বিরিঞ্চিকে গাইতে দাও আগে। তোমার গান ভালো হয়েছে। একটু জিরিয়ে নাও। তারপর গাইবে।

বিরিঞ্চি সত্যিই ভালো গায়। একতারার তারে মোচড় দিয়ে ডুগি চাপড়ে প্রথমেই একপাক নেচে সে অদ্ভুত এক ভঙ্গিমা করে গেয়ে উঠল—

ও তার রাঙা পায় কোটি চাঁদ উদয় হবে
এই মানুষ সন্ন্যাসী নাকি সখি তোরা দেখসে আয়
এলো এক সোনার মানুষ কাটোয়ায়—

মনোহর ক্ষ্যাপা 'আহা-আহা' করে উঠলেন। তারপর জনতা। জন সমুদ্রে যেন কল্লোল উঠল। এক পাক নেচে বিরিঞ্চি গাইল—

আমি গিয়েছিলেম জল আনিতে
আমার ঘোমটা খুলে যায় দৈবেতে
দেখে সে রূপ কটাক্ষেতে
সঁপেছি হৃদয়—

গানের সুরে চারিদিক যেন ভরে উঠল। যেমন গলা তেমনি গান।

অমন একজন বিশ্রী চেহারার মানুষের গলায় যে এত সুর কোথায় লুকিয়েছিল তা ভেবে পেলাম না। গান চলেছে—

আর পারিনা ঘোমটা দিতে
মন সরে না ঘরে যেতে
মন গেছে তার রূপের সাথে
ফেরানো হয়েছে দায়—
তার কিসের অভাব ছিল ঘরে
সন্ন্যাসী হয় তারি তরে
কোন প্রাণে ভারতী তারে (কেশব ভারতী)
সন্ন্যাসী বা করে দেয়।

গানের আসর ছেড়ে যখন আমরা বেরোলাম তখন পথ চলা দায় হয়ে উঠেছে। কি ভিড়। কি ভিড়! রঙ বেরঙের সেই মানুষের ভিড়ে তাদের আকুল উচ্ছ্বাসের কোলাহলে খোল, ঢোল ও মৃদঙ্গের সুর মূর্চ্ছনায় আমরা মেতে উঠলাম।

চারিদিকে মহোৎসব সুরু হয়ে গেছে তখন। আখড়ায় আখড়ায় কাঠের জ্বালে বড় বড় হাঁড়ি কড়ায় ভাত তরকারি ফুটছে। খাওয়া দাওয়াও সুরু হয়ে গেছে। ব্যঞ্জনের গন্ধে ভরপুর বাতাস। ধোঁয়ার কুণ্ডলি বাতাসে ভেসে যেন স্বর্গে উঠছে। কি আনন্দ। কি আনন্দ।

সাঁওতালি মেয়েরা খোঁপায় ফুল গুঁজে মেলায় এসেছে। ভিড়ের চাপে খিল খিল করে হাসছে তারা। কদমখণ্ডীর ঘাটে ন স্থানং তিল ধারণং। আমরা আঘাটায় গেলাম। সেখানেও ভিড়। নদীর জল মানুষে থুক থুক করছে। গিজ গিজ করছে মানুষ। শীতের রোদ্দুরে এঁকে বেঁকে বয়ে চলা স্বচ্ছ জলধারায় অবগাহনরত মানুষের সেই মেলা যে কি অপরূপ তা অবর্ণনীয়।

ওপারে বালির চড়ায় সারি সারি গরুর গাড়ি আর পাল্কি। গরুর গাড়ির লেখা জোখা নেই। হাজার হাজার গরুর গাড়ি। অজস্র। অগণতি। একে তো ধূসর বালু। তার ওপরে খেলাঘরে সাজানো খেলনার মতো ছত্রি আঁটা গরুর গাড়িগুলো রৌদ্র কিরণে উজ্জ্বল হয়ে চোখে যেন ছটা লাগাল।

আমি মুগ্ধ হয়ে প্রকৃতির সেই রূপ ধ্যান করতে লাগলাম। বার

বার ঈশ্বরকে জানালাম, হে ঈশ্বর আমি যেন জন্ম জন্মান্তরেও এই মানব তীর্থে উদার আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে এই অতুল আনন্দানিল হিল্লোলে মহামানুষের এই কলধ্বনি শুনতে পাই। দেখতে পাই এই রঙ-বেরঙের বৈচিত্রতা। আমি যেন এখানে আসতে পারি বারে বারে। আমার চিন্তায় বাধা পড়ল। কে যেন আমার চিন্তার সমস্ত জালগুলোকে ছিন্ন ভিন্ন করে দিল। শুনতে পেলাম—কি লোকরে বাবা। কখন থেক্যে দাঁড়িয়ে আছে এক জায়গায়। ক্ষিদে পেয়েছে, চলো ঘরকে যাই। এ্যাত্তো কি দেখবার আছে?

কেন জানি না আমি সংযম হারিয়ে ফেললাম। ঠাস করে প্রবল বেগে মেরে বসলাম একটা চড়।

ওর চোখের সামনে দুনিয়াটা অন্ধকার হয়ে গেল।

—ব্যাটা বেরসিক। ভালো না লাগে চলে যা তুই। পাপ কোথাকার।

সে দুহাতে মুখ ঢেকে মাটিতে বসে পড়ল।

আমি আবার সেই বৈচিত্রতাকে দেখতে লাগলাম। কিন্তু আর ভালো লাগল না। একাগ্রতা একবার ভেঙে গেলে আর আসে না সহজে। মনটা এমনভাবে খিঁচিয়ে গেল যে কিছুতেই একাত্ম হতে পারলাম না আর। মনে মনে রেগে গেলাম খুব। এই জন্যই আমি চিরকাল একলা ঘুরি। আমার সঙ্গে কেউ আসতে চায়ও না: আর চাইলেও তাকে পাত্তা দিই না। কিন্তু এই পাপ সেই ভুবনেশ্বর থেকে এমন ভাবে পিছনে লেগেছে যে একে এখন টেনে ছাড়ানো দায়।

অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলাম। তারপর ন্যাড়ার ঝোলা থেকে কাপড় আর গামছাটা টেনে নিয়ে নেমে পড়লাম বালিতে। ওর সঙ্গে কথা কইতেও আমার প্রবৃত্তি হ'ল না আর। ও বোধ হয় বুঝতে পারল সেটা। ও বুঝল, ও আসুক বা নাই আসুক আমি ওকে ডাকব না। তাই সুবোধ ছেলেটির মতো পিছু পিছু এলো আমার।

নদীর বালিতে নেমে ঝোলা থেকে শিশি বার করে জামা কাপড় ছেড়ে গামছা পরে গায়ে তেল মেখে নাইতে নামলাম। নদীর জলে ছোট ছোট কত মাছ ভেসে যাচ্ছে। কত লোক স্নান করছে নদীতে।

তাদের সঙ্গে আমিও স্নান করলাম। গায়ত্রী জপ করে সূর্য প্রণাম করলাম—

ওঁ জবাকুসুমুম শঙ্কাসং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্যান্তারিং সর্ব পাপঘ্ন প্রণহোতোস্মি দিবাকরম্।

এমন করে এত ভক্তির সঙ্গে এর আগে আর কখনো সূর্যদেবকে প্রণাম করেছি বলে মনে পড়ল না। স্নান করে সূর্য প্রণাম সেরে উঠে এলাম। ন্যাড়া শীতের ভয়ে নাইল না! আমার পিছু পিছু আসতে লাগল। আমার যেন ক্ষুধা তৃষ্ণা সব লোপ পেয়ে গেছে। আবার আমি পাগলের মতো মেলায় ঘুরতে লাগলাম। ন্যাড়া আর থাকতে পারল না। বলল—তুমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি গ? আমি তো জানতাম মাথাটা আমারই খারাপ। বলি কত বেলা হ'ল তা খেয়াল আছে? তোমার না ক্ষিদে থাকতে পারে, মহাপুরুষ তুমি। আমার তো আছে। আমাকেও যদি বাদ দাও, যারা আমাদের পথ চেয়ে বসে আছে তাদের ওপরও কি তোমার কোন কর্তব্য নাই?

এতক্ষণে সম্বিত ফিরে পেলাম আমি। এর আগে আমি যেন বাহ্য জগতেই ছিলাম না। এবার আমার খেয়াল হ'ল। সত্যিই তো, খুব ভুল হয়ে গেছে। বললাম—আচ্ছা মনে করে দিয়েছিস বটে। চল, চল, শিগ্‌গির্ চল।

ন্যাড়া ঘাড় হেঁট করে চলতে লাগল আমার পিছ পিছু। একান্ত অনুগতের মতো। দেখে মায়া হ'ল। কেন যে মারলুম তখন।

—খুব লেগেছে না রে?

—তুমার সঙ্গে আমি কথা বলব না।

—ও বাবা! আবার রাগ?

—রাগ! অত্তো বোকা নই যে পাথরের ওপর রাগ করব।

—আমি পাথর?

—তা নয় তো কি?

—বেশ। তবে তাই। আমি পাথরই। কিন্তু একটা কথা, কখনো কারো ভাব নষ্ট করিস না। ওর মতো পাপ আর নেই। তখন তোকে আমি মারতাম না। হঠাৎ যে কি হয়ে গেল, রাগের মাথায় মেরেই বসলাম। যাক, কিছু মনে করিস না যেন, বুঝলি?

—না গ না। কিচ্ছু মনে করিনি আমি। তুমি আমার দাদ্দা হও, না হয় এক ঘা মেরেই দিয়েছ। মেরেছ বেশ করেছ। আবার মারবা? মারো।

আমরা পথ চলতে লাগলাম। দীর্ঘ পথ। সহজে শেষ হতে চায় না। বালির চরার পাশে ঘন গাছ পালার ফাঁকে ফাঁকে আশ্রমের পথ। পথের ধারে ধারে কাঁটাগাছ। একটু অসতর্ক হলেই পায়ে বেঁধে। কাঁটা বাঁচিয়ে আমরা পথ চলতে লাগলাম। তা সত্ত্বেও পায়ের আসপাশগুলো কাঁটার আঁচড়ে ছড়তে লাগল।

আশ্রমে যখন আমরা ফিরে এলাম তখন বেলা অনেক হয়েছে। সাধুবাবা গেনি আর কুন্তলা আমাদের পথ চেয়ে বসেছিলেন তখনও। আর রামধনি সেই সবে খেয়ে উঠেছে।

সাধুবাবা আমাদের দেখেই বলে উঠলেন—ওই তো! ওই তো এসে গেছে। আমি জানি ওরা আসবে ঠিক। তোমরা খালি মাঝখান থেকে আসবে না আসবে না করে ব্যতিব্যস্ত করে তুলছিলে। অতিথি নারায়ণ। তাদের সেবা না করিয়ে আমি কখনো খেতে পারি?

আমি লজ্জিত হলাম খুব। বললাম—সত্যি, অন্যায় হয়ে গেছে বাবা। বড্ড দেরি করে ফেলেছি। এত দেরি করা ঠিক হয়নি। আসলে বাঁধা গরু ছাড়া পেয়েছি তো।

সাধু বললেন—নাও বাবা, হাত পা ধুয়ে নাও। এত বেলা হ'ল। সেই কখন সকালে দুটি মুড়ি আর আলুসেদ্ধ খেয়ে গেছ। এতক্ষণে খিদে পেয়েছে নিশ্চয়ই, এবার খেয়ে নাও।

আমরা কলে গিয়ে হাত পা ধুলাম।

ন্যাড়াটা ফড় ফড় করতে লাগল—উনি আমাদের ক্ষ্যাপ্পা ঠাকুর। কখন যে কি ভাবে থাকেন তা বোঝা দায়। আমি কখন থেক্যে তাড়া লাগাচ্ছি। তা ভালো কথা, না আমাকেই দিলো এক চড়। ভাইয়ের একটা কথায় যার এত রাগ। বউ এলে সে কি করে একবার দেখব।

ন্যাড়ার কথা শুনে ফিক করে হেসে ফেলল কুন্তলা। সে বেচারি আমাদের খেতে দেবার ব্যবস্থা করছিল। তার চোখে আমার চোখ পড়তেই লজ্জায় মুখ ঘুরিয়ে রান্নাঘরে চলে গেল সে।

আমি প্রসঙ্গ পাল্টাবার জন্য বললাম—বাবার খাওয়া হয়নি। বাবাকেও খেতে দিচ্ছেন তো ?

গেনি উত্তর দিলেন—হ্যাঁ। বাবাকে ঘরে জায়গা করে দিচ্ছি।

আমরা খেতে বসলাম। একেবারে রাজসিক খাওয়া যাকে বলে। ঝাল ঝোল ছেঁচকি অম্বল সব রকমই ব্যবস্থা হয়েছিল। কুন্তলা পরিবেশন করছিল আমাদের।

হঠাৎ কি হ'ল। কে জানে, ন্যাড়া খাওয়া ফেলে উঠে গিয়ে মুখ হাত ধুয়ে রান্নাঘরে গেনি আর কুন্তলার হাত ধরে টেনে বসাল। বসিয়ে বলল—আগে তুমরা খাও। তব্যে আমি খাবো। নইলে খাব্বো না।

গেনি হাঁ হাঁ করে উঠলেন—আরে পাগল ছেলে। আমরা খাচ্ছিরে বাবা, তোমরা আগে খাও।

—না। আমরা খাব্বো না। হয় তুমরা আগে খাও না হলে আমার মাথা খাও। খাব্বো না আমি

—আচ্ছা, খাচ্ছি। তুমি গিয়ে খেতে বসো আগে। খেতে খেতে উঠে আসতে নেই।

আমি মজা দেখছিলাম বসে বসে। মজা দেখছিলাম আর খাচ্ছিলাম।

গেনি বললেন—তোমাদের খাওয়া না হলে যে আমাদের খেতে নেই বাবা। ওখানে গিয়ে বরং দেখো তোমার দাদা কিছু নেয় কি না।

—না না। কিচ্ছু নিবে না ও। আগে তুমরা খাও দেখি ? তুমি না খাও নেই নেই। ওই মেয়েটাকে খাওয়াও। আমাদের জন্যে এই কচি মেয়েটাকে শুদ্ধু টাঙ্গ্যে রেখে দিয়েছ। কি আক্কেল গ তোমার ?

ন্যাড়ার কীর্তি দেখে কুন্তলা মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হেসে গড়িয়ে পড়ল। আমি আড়চোখে দেখলাম কুন্তলাকে। কুন্তলাও দেখল আমাকে ! আমি ইশারায় ওকে বুঝিয়ে দিলাম যে মাথার দোষ আছে ন্যাড়াটার। কুন্তলা বুঝল সে কথা। ন্যাড়াকে ক্ষ্যান্ত করবার জন্য বলল—আচ্ছা আচ্ছা, আমি খাচ্ছি। যাও, তুমি গিয়ে খেয়ে নাও তোমার পাতের ভাত।

সাধুবাবাও ঘর থেকে ডাকলেন—বাবা, এসো এসো। খেয়ে নাও। পাতের ভাত ফেলে উঠতে নেই বাবা। মা লক্ষ্মী চঞ্চলা হন।

ন্যাড়া কিছুতেই এলো না। উপরন্তু কুন্তলা আর গেনিকে পাশাপাশি বসিয়ে নিজে হাতে তাদের পরিবেশন করে খাইয়ে তারপর এসে খেতে বসল।

খাওয়া দাওয়া হলে সাধু বললেন—বাবা, কোন অসুবিধে হ'ল না তো? আমি বনবাসী সাধু। এর চেয়ে বেশী কিছু করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

আমি লজ্জিত হয়ে বললাম— এতই বা করতে গেলেন কেন আপনি? আমরা কে যে এত যত্ন করছেন আমাদের? আপনার এখানে আমরা যে একটু আশ্রয় পেয়েছি এই তো আমারে পরম সৌভাগ্য।

সাধু প্রশান্ত বদনে সৌজন্যতার হাসি হাসলেন। তাঁর হাসি দেখে বুঝলাম তিনি সন্তুষ্ট হয়েছেন আমার প্রতি। আমি যেখানে একটু রোদ্দুর এসে লুটিয়ে পড়েছিল সেখানে গিয়ে বসলাম। গেনি আমাদের এঁটো বাসনগুলো নিয়ে এসে মাজতে লাগলেন কল তলায়। ন্যাড়া আর কুন্তলা ঝাট পাঁট দিয়ে নিকোতে লাগল চারিদিক।

বিকেলবেলা গেনি আর কুন্তলাকে নিয়ে ন্যাড়া গেল মেলা দেখতে। সাধুবাবা অনেক করে মানা করেছিলেন। কেননা তিনি জানতেন তাঁর ওপর কেউ সন্তুষ্ট নয়। এ অঞ্চলের প্রায় প্রতিটি লোকই কিরূপ। তাই এই মেলার ভিড়ে কুন্তলাকে নিয়ে যাওয়াটা তিনি ভালো মনে করেন নি। কিন্তু ন্যাড়ার বায়নাক্কার কাছে তাঁকে হার মানতেই হ'ল। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি অনুমতি দিলেন।

আমারও যে যাবার ইচ্ছা ছিল না তা নয়। কিন্তু সাধুবাবা আমাকে একটি কাজের ভার দিলেন। পাশের গ্রামে এক কাঠগোলায় তাঁর একটি তক্তাপোষ করতে দেওয়া ছিল সেটি রামধনির সাহায্যে আমাকে নিয়ে আসবার ভার দিলেন। তাই ইচ্ছে থাকলেও মেলায় যাওয়াটা চেপে রাখতে হ'ল। এবং খাওয়া দাওয়ার পর আশ্রমের বাইরে যেখানে সেই বৃদ্ধ ভিক্ষু গান গাইছিল সেইখানে গিয়ে বসলাম।

এখানটা একেবারে খোলা। রোদের প্রাচুর্যতায় ভরা। চারিদিকে সোনার বরণ মাটি যেন হাসছে। অজয়ের হলুদ বালি চিক্ চিক্ করছে। পাখিরা গান গাইছে গাছে গাছে। আমাকে দেখতে পেয়ে বৃদ্ধ ভিক্ষু গান গাইতে গাইতেই মৃদু হেসে অভ্যর্থনা জানাল। তারপর যখন তার কাছে গিয়ে মাটিতে ঘাসের উপর বসলাম, তখন জিজ্ঞেস করল—কি? আপনি থাকতে চান নাকি আশ্রমে?

—হ্যাঁ। দু' একদিন থাকব। বাবার এখানে মহোৎসব। এসে যখন পড়েছি তখন থেকেই যাই।

—বেশ। সকালে দেখলাম আপনাকে। আমি ভাবলাম বোধ হয় দর্শন করতে এসেছেন। এসেই চলে যাবেন। ভালো হয়েছে। থাকুন।

—আমি কিন্তু আপনার গান শুনে খুব মুগ্ধ হয়ে গেছি।

—ভগবানের ইচ্ছা।

—কিন্তু আপনাকে দেখে অবাকও হয়ে যাচ্ছি খুব।

—কেন বাবা!

—সেই সকাল থেকেই তো দেখছি একভাবে গেয়ে চলেছেন। বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই। গলা ব্যথা করছে না আপনার?

আমার কথা শুনে বৃদ্ধ হাসল। হেসে বলল—গানই যার জীবন, গান গেয়ে কি তার গলা ব্যথা করে ভাই?

কখনো বাবা কখনো ভাই। যাই হোক। বৃদ্ধের কথাগুলি বড় মধুর। বললাম—তা সারাদিনের খাওয়া দাওয়াটা?

—এরই ফাঁকে সেরে এলাম। এই তো খেয়ে আসছি। সন্ধ্যে পর্যন্ত গাইব। গেয়ে চলে যাবো।

—কোথায় থাকা হয়?

বৃদ্ধ অঙ্গুলি নির্দেশে দেখাল—ঐ—ঐখানে আমার ঘর। ঐ যে কলাপাতার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে।

চেয়ে দেখলাম আমাদের আশ্রমের পিছনে কলাগাছ ও অন্যান্য কয়েকটি গাছ পালার আড়ালে ছোট্ট একটি কুঁড়ে। সেই কুঁড়ে ঘরের ছাউনিটা পাতার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে। দেখে অবাক হয়ে গেলাম। আশ্চর্য! মানুষটা একলাটি এখানে থাকে কি করে?

—এই জনমানবহীন প্রান্তরে আপনি থাকেন, আপনার চলে কি করে?

আমার কথায় সে হাসল। কিছু বলল না। বরং আমিই বললাম—আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব?

—করুন।

—আপনার আমি অন্ত পাচ্ছি না। এক তো থাকেন এই মরুভূমিতে। তার ওপর আপনার যখন এমন চমৎকার গলা তখন আপনি এখানে এই অরণ্যে কেন রোদন করছেন? কালে ভদ্রে কে

কখন আসবে তার ঠিক নেই। তার চেয়ে মেলায় গেলে তো কিছু রোজগার হোত। এখানে আপনার লাভটা কি ?

আমার কথায় হো হো করে হেসে উঠল সে—আমি ভিখারি নই বাবা। ভিখারি নই। এ আমার জীবিকা নয়।

—তাহলে আপনি কি ? আপনার চলে কি করে ?

—ভগবান। ভগবান চালিয়ে দেন।

—কথাটা ভিত্তিহীন। কারণ ভগবান কখনোই কারো কিছু চালিয়ে দেন না। এবং দেন না বলেই সৃষ্টির সময় মানুষের অঙ্গে চলে বেড়াবার জন্য পা এবং সৎ ভাবে করে খাবার জন্য হাত দুটি জুড়ে দিয়েছেন।

বৃদ্ধ বলল—কিছু বুঝলেন না তো ? তাহলে বলি শুনুন।

শুনুন বলে যে কথা সে শোনাল তা শুনে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম। মুগ্ধ হলাম এইজন্য যে এই রকম জীবন আমি দেখতে চেয়েছিলাম। এই রকম মানুষও আমি দেখতে চেয়েছিলাম। এই জীবন সেই জীবন। এই আমার সেই মানুষ।

মানুষটির অবস্থা ভালোই। শ্যামরূপার গড়ে তার ঘর। ছেলেমেয়ে সবাই আছে। কিছুদিন আগে তার স্ত্রী মারা গেছে। মেয়েদের বিয়ে হয়েছে। ছেলেরা বউ নিয়ে ঘর সংসার করছে। জমি জমাও প্রচুর। সেই সব দেখা শোনার জন্যই সে এখানে কুঁড়ে বেঁধে পড়ে আছে। ছেলেবেলায় বাউলদের সঙ্গে কর্তনীয়াদের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে গান গাইতে শিখেছে। বাউলের একতারা হয়েছে তার প্রাণ। সেই প্রাণ ঝরণার সুধা ঝরিয়ে এই মুক্ত প্রান্তরে সে গান গেয়ে বাস করে। সংসারে ফেরেনি আর। খায় দায় গান গায়। মাঝে মাঝে হাটে বাজারে যায়। আলুটা বেগুনটা নিয়ে আসে। ভাতে ভাত ফুটিয়ে খায়। আনন্দে থাকে। সুখে থাকে। আনন্দের গান গায়। সুখের গান গায়। তার এই গান মানুষের অন্তরকে জয় করবার জন্য নয়। সকলের যিনি চিন্তা করেন, জগতের পতি, জগতের চিন্তা যিনি করেন, সেই জগৎ চিন্তামণি ঈশ্বরের উদ্দেশে তার এই গান গাওয়া। এই গানের রেশ তাঁর চরণে গিয়ে পৌছলেই সে সার্থক হবে। এই গান তার ঈশ্বরের জন্য। এই মাঠ, এই বন, এই নদী, এই প্রান্তরকে শোনাবার জন্য এই গান।

সব শুনে বললাম—তাহলে এখানে এসে গান শুনে কেউ আপনাকে পয়সা দিলে তা নেন কেন ?

—আমি তো নিই না। যা কিছু পাই তার সমস্ত আমি জয়দেবে রাধামাধবের মন্দিরে দিয়ে আসি।

আমি অবাক হয়ে গেলাম। এবার বুঝতে পারলাম এত লোকের এত গান শোনার পরও বিশেষ করে এই লোকটির গান আমাকে এত মুগ্ধ করেছে কেন। মানুষকে শোনাবার জন্য, মানুষের অন্তরকে জয় করবার জন্য সে গান, তার কাছে ঈশ্বরকে শোনাবার জন্য গাওয়া গানের যে অনেক প্রভেদ তা আমি হৃদয় দিয়ে অনুভব করলাম।

আমি তন্ময় হয়ে গান শুনছিলাম। এমন সময় রামধনি এলো। বলল—সাধুবাবার চৌপয়া আনতে যাবেন না ?

আমি অভিভূতের মতো বললাম—চলো। বৃদ্ধের কাছে বিদায় নিয়ে দুজনে বনের ভিতর দিয়ে পথ চলতে লাগলাম।

সন্ধ্যের সময় তক্তাপোষ নিয়ে ফিরে এসে দেখি ওরা সবাই এসে গেছে। ন্যাড়া, গেনি, কুন্তলা সবাই। তক্তাপোষ পেয়ে সাধুবাবা খুব খুসি হলেন।

ন্যাড়া বলল—একজনের ওপর ভারি কাজটা চাপিয়ে দিয়ে আমরা কেমন বেড়িয়ে এলাম। বেশ হয়েছে। একজন যেত্যে পায়নি।

সাধু বললেন—তুই বাবা বড় ঝগড়াটে। আসতে না আসতেই ঝগড়া বাধাতে বসে গেলি। অত কষ্ট করে অত দূর থেকে এলো ওরা। মুখ হাত ধুক, চা টা খাক।

—হ্যাঁ তাই না, সন্ধ্যের সময় চা খাবে। এখন গান টান হোক। ঠাকুরের নাম হোক। যা খাবার তারপর খাবে। উর্সব এখন চলবা না। হাত পা'টো বরং ধুয়্যে নিক।

কুন্তলা দেখলাম ব্যস্ত হয়ে পড়েছে সন্ধ্যে দেবার জন্য।

গেনি চার পাঁচটা ভারি খঞ্জনি আমার হাতে দিয়ে বললেন—যাও। বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের ভিটেয় আরতি হবে। সেখানে গিয়ে দাঁড়াও। আমরাও সব যাচ্ছি।

আমি চললাম। আমার আগে আগে সন্ধ্যে পিদিম হাতে নিয়ে কুন্তলা চলল। চারিদিকে তখন অন্ধকার নেমে এসেছে। সেই আবছা আঁধারে আলো জেলে মৃদু বাতাসের হাত থেকে পিদিমের শিখাটিকে বাঁচাতে বাঁচাতে সন্তর্পণে পথ চলা কুন্তলার পিছু পিছু আমি চললাম।

হঠাৎ কুন্তলা থামল।

আমি ও থামলাম।

ও একবার চেয়ে দেখল আমার দিকে। আমিও ওর দিকে চেয়ে দেখলাম। মৃদু হাসল ও। আমিও হাসলাম।

পিদিমের শিখায় ওর মুখখানি দেখতে আমার ভালো লাগল। মনে মনে ভাবলাম ওর মা-ও নিশ্চই সুন্দরী ছিলেন ওর মতো। নাহলে সাধুবাবার মেয়ের তো এত রূপ হবার কথা নয়।

কুন্তলা আবার চলতে লাগল। চলতে চলতে বলল—আপনি গান জানেন? ঠাকুরের গান?

—উঁহু। শিখলাম কবে?

—এখানে কিন্তু গাইতে হবে।

—কেমন করে গাইব?

—তা আমি কি জানি। আমরা সবাই গাইব। আমাদের সঙ্গে গাইতে হবে। আজ আমার শচীদাদা এসেছেন, রোহিণী মা এসেছেন। শচীদাদা ভালো গান গাইতে পারে।

—শচীদাদা ভালো গাইতে পারে তো আমার কি? আমি শুনব তোমার গান।

—আমি তো গাইব-ই। তবে খঞ্জনিটা আমার ঠিক আসে না। ওটা আপনাকে বাজাতে হবে।

আমার হাসি পেল। বললাম—কখনো বাজাইনি। আজ কি করে বাজাবো?

—সে আমি কি জানি, যেমন করেই হোক বাজাতে হবে। আন্দাজে বাজাবেন।

—বেশ। তাই বাজাব।

কথা কইতে কইতে আমরা ঠাকুরের ভিটেয় এসে পৌছলাম। পৌছে দেখলাম একজন অল্প বয়সি বেঁটে গোঁসাই এবং মধ্যবয়সি এক বিধবা বৈষ্ণবী বসে আছেন ভিটের চাতালে মাদুর বিছিয়ে।

কুন্তলা বলল—এই আমার শচীদাদা। ভবঘুরে গোঁসাই। আর ইনি রোহিণী মা। প্রতি বছর মেলায় আসেন এঁরা।

বললাম—জয় নিতাই। কুশল তো আপনাদের?

গোঁসাই বললে—জয় নেতাই। বাবার কাছে আপনার কথাই হচ্ছিল একটু আগে। তা জয় হোক। বসতে আজ্ঞা হোক আমাদের পাশে।

আমি হাত তুলে রোহিণী মাকে নমস্কার জানালাম। জানিয়ে বসলাম। কুন্তলা তমাল তলে সন্ধ্যে দিতে গেলেন। আমি মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম তার দিকে।

একটু পরেই ওরা এসে পড়ল সব। ন্যাড়া, গেনি, রামধনি আর সাধুবাবা। রামধনির হাতে আলো ছিল। আলোটা সে দাওয়ায় বসিয়ে রেখে নিজে গিয়ে বসল একপাশে। ন্যাড়া ইতি মধ্যেই সাধুবাবার একটি পট্টবস্ত্র পরিধান করে কপালে লম্বা তিলক কেটে দিব্যি কিম্ভুত কিমাকার একটা জীব সেজে বসে আছে।

কুন্তলা আরতির ব্যবস্থা করল।

সাধুবাবা আরতি করলেন।

তারপর শচীকে বললেন—গান আরম্ভ করো সচ্চিদা।

সচ্চিদা বলল—আগে আপনি ধরুন।

আমাদের হাতে হাতে খঞ্জনি চলে এলো। একমাত্র রামধনি বাদে। রামধনি বলল—ও সব হামি পারবে না। হামি হাতে তাল রেখে গানা করবে।

—তাই হবে।

সাধুবাবা গান ধরলেন। তাঁর নিজের রচনা করা পদ—

জয় জয় শচীসুত শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য

জয় নিত্যানন্দ অবধূত অগ্রগণ্য।

গান চলল। গান ঠিক নয়, স্তোত্র বলা উচিৎ। তারপর সুরু হ'ল—

শ্রীনন্দ রাখিল নাম নন্দের নন্দন

যশোদা রাখিল নাম যাদুবাছাধন

উপানন্দ নাম রাখে সুন্দর গোপাল—

সব শেষ হলে খঞ্জনির ঝন ঝন শব্দে চারিদিকের স্তব্ধতা খান খান হয়ে গেল। কুন্তলা ফিস ফিস করে বলল—তবে যে বললেন আপনি বাজাতে জানেন না?

—এ তো আন্দাজে বাজালাম।

—এঃ। তাই বৈকি! সব জানে। বলে কিনা জানি না। তীর্থে এসে মিথ্যে কথা বলছেন। আপনার অনেক পাপ হবে।

এবার প্রণামের পালা। ঠাকুর বিল্বমঙ্গলের ভিটেয় প্রণাম করে আশ্রমে গিয়ে ঢুকব সকলে। গেনি আলো নিয়ে চললেন আগে আগে। তার পিছনে ন্যাড়া আর সাধুবাবা। তারপরে সচ্চিদা ও রোহিণী। সব শেষে কুন্তলা, আমি ও রামধনি।

সন্ধ্যার জলযোগ শেষ হলে সাধুবাবার ঘরে ডাক পড়ল আমার। এতক্ষণ ন্যাড়ার সঙ্গে বাবা কথা বলছিলেন। এবার আমি গিয়ে যোগ দিলাম। বাবা বললেন—ন্যাড়া আমার এখানে মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য সত্যবন্দী হয়েছে। বলছে যত টাকা লাগবে ও নাকি সব দেবে।

—এ তো ভালো কথা। ও যখন অত বড়লোকের ছেলে। প্রচুর সম্পত্তির মালিক। মালদহে আমের ব্যাপারি। ওর তো করে দেওয়া উচিৎ!

—আমি দুবো বলেছি যখন দুবো। শিবের বাবাও আমাকে টলাতে পারবে না। কিন্তু তার আগে তুমিও বাবার কাছে সত্যবন্দী হও যে তুমিও বাবার উপকার করবে।

কুন্তলা আমাদের জন্য চা নিয়ে এলো।

চায়ে চুমুক দিয়ে আমি বললাম—আগে শুনি কি উপকার করতে হবে? আমার সাধ্যের মধ্যে যদি হয় তো নিশ্চয়ই করব। তা নাহলে শুধু শুধু সত্যবন্দী হবো কেন?

কুন্তলা তখন বিছানার ওপর ঝুঁকে পড়ে সাধুবাবার মন্দিরের নক্সা দেখছে। মন্দিরটা কি রকম হবে সে সম্বন্ধে সাধুবাবা ইতিপূর্বেই একটি প্ল্যান করে রেখেছিলেন।

ন্যাড়া বলল—আগে বলো তুমি বাবাকে সাহায্য করবে কি না।

আমি হেসে বললাম—কিসের সাহায্য শুনিই না আগে?

—আমার টাকা আছে আমি মন্দির বানিয়ে বাবার মনস্কামনা পূর্ণ করব। কিন্তু তুমি যখন তা পারবে না তখন অন্যদিক দিয়ে বাবাকে সাহায্য করো।

সাধুবাবা দেখলাম কেমন এক বিবর্ণ চোখে তাকিয়ে আছেন আমার দিকে। বললেন—ভগবান তোমাদের আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন বাবা! আমি জানি তোমরা আমার উপলক্ষ।

আমি বললাম—আপনার অনুমানের সত্যাসত্য কতটুকু তা আমি বলতে পারব না। তবে আমি ঠিক বুঝতে পারছি না আমাকে কি করতে হবে।

সাধুবাবার হয়ে ন্যাড়াই বলে দিল কথাটা—তোমাকে বিয়ে করতে হবে। কুন্তলাকে।

আমি যেন আকাশ থেকে পড়লাম—বিয়ে! কুন্তলাকে?

সাধুবাবা আমার হাত দুটি চেপে ধরলেন।

কুন্তলা লজ্জায় পালিয়ে গেল ঘর থেকে।

সাধুবাবা বললেন—তুমি অমত কোর না বাবা। আমার এই একটি মাত্র মেয়ে। আমি বনবাসী সাধু। আমার পক্ষে ওর বিয়ে দেওয়া কি করে সম্ভব? ঈশ্বরের ইচ্ছেয় তোমরা যখন এসে পড়েছ এখানে, বামুনের ছেলে, দয়া করে আমাকে এ দায় থেকে উদ্ধার করো। তাছাড়া সত্যি কথা বলতে কি তোমার মতো ছেলেই আমি খুঁজছিলাম। আর আমার মেয়েকেও তো দেখতে খারাপ নয়। ওর দিকে মুখ তুলে চাও।

—কিন্তু…।

—কোন কিন্তু নয়। আমার বিশ্বাস তোমার কাছে আমার মেয়ে সুখে থাকবে।

ন্যাড়া বলল—আমার মতো একটা বাঁদরকে পুষতে পারছ, আর একটা মেয়েকে দুবেলা দুটো ভাত দিতে পারবা না?

—তুমি কথা দাও বাবা।

আমি বললাম—এখনই আমি কিছু বলতে পারছি না। আমাকে একটু ভাবতে দিন।

—বেশ। কাল তাহলে জানিও। বলে প্রসঙ্গ পাল্টে সাধুবাবা আবার মন্দিরের কথায় ফিরে এলেন।

সে রাত্রিটা আরামেই কাটল বেশ। রামধনি রান্নাঘরে খড় বিছিয়ে বিছানা পেতে দিল। আমি আর ন্যাড়া শুয়ে পড়লাম। রামধনিও এসে শুলো। আমি শুয়ে শুয়ে কুন্তলার কথা ভাবতে

লাগলাম। ন্যাড়ার ওপরেও রাগে আমার গা জ্বলে যাচ্ছিল। কুন্তলাকে বিয়ের জন্য সাধুবাবাকে ঐ ব্যাটাই নাচিয়েছে ঠিক।

পরের দিন ভোর বেলা সচ্চিদানন্দর গান শুনে আমাদের ঘুম ভেঙে গেল। সেই অস্পষ্ট ভোরে কনকনে শীতকে উপেক্ষা করেও সচ্চিদানন্দ দিব্যি হারিকেন জ্বেলে গান গাইতে বসেছে—

রাই জাগো রাই জাগো বলে শুকসারি ভনে
কত নিদ্রা যাও গো রাধে শ্যাম নাগরের সনে।

গান যখন শেষ হ'ল দিনের আলো তখন ফুটে উঠেছে। কুন্তলার মিষ্টি হাসির মতো মিষ্টি রোদ্দুরে ভরে উঠেছে চারিদিক। কুন্তলাকে আজ অপূর্ব দেখাচ্ছে। আজ যেন তাকে নতুন চোখে দেখলাম। আগের দিনে যে চোখে দেখেছি আজ আর সে চোখ নেই। কুন্তলাও যেন নতুন করে দেখল আমায়। বড় ভালো লাগল তার এই চাউনিটুকু।

মুখ হাত ধুয়ে কুন্তলার হাতে তৈরী রুটি আর চা খেয়ে আমি বিদায় নিলাম। সচ্চিদাও চলল আমার পিছু পিছু। সে যাবে মেলায় সাধুবাবার লেখা বই বেচতে। আর আমি যাবো বেড়াতে। আসবার সময় বলে এলাম খাওয়া দাওয়া আমাদের মেলাতেই হবে। আজ মেলাতলায় মহোৎসবে সেবা করব। মেলায় গিয়ে মহোৎসবে সেবা না করলে নাকি মেলা বেড়ানো অসম্পূর্ণ হয়। অতএব আমাদের জন্য এবেলা আর কোন কিছুই করতে হবে না।

মেলা আজ কালকের মতোই জমজমাট! কাঙালক্ষ্যাপার আশ্রমের সামনে কীর্তন হচ্ছে। গাইছেন এক তরুণ কীর্তনীয়া। তাঁকে ঘিরে নানা জাতের মানুষ ভিড় করে দাঁড়িয়েছে। ভিড় হবার কারণও আছে। কারণটি হ'ল গায়কের বিনয় মিশ্রিত দরাজ গলা। ভাবে বিভোর হয়ে গাইছেন তিনি। চমৎকার গান। গলায় যেন মধু ঢেলে গাইছেন—

"রাধারাণী সখিগণকে ডেকে বললেন, সখিরে, আমি নিজে যেয়ে আমাদের শ্যামের রূপ আজ দেখে এসেছি। সে রূপ আমি ভুলতে পারছি না। তাই শুনে সখিগণ বললেন, রাধারাণী, তুমি এমন কি রূপ দেখে এসেছ যে সে রূপ তুমি ভুলতে পারছ না?

"তখন রাধারাণী বললেন, সখিরে, আমি কি রূপ দেখে এসেছি তা আমি তোদের কাছে বলছি শোন—

দেখে এলেম তারে সখি
দেখে এলেম তারে—
ওগো, একই অঙ্গে এত রূপ
নয়নে না ধরে।
আমার নয়নে রূপ ধরে না গো,
আমি রূপ দেখে আর ভুলতে নারি
আমার নয়নে রূপ ধরে না—

"সখিরে আমি আরো যে রূপ দেখে এসেছি তা তোদের কাছে বলছি শোন—

বেঁধেছে বিনোদ চূড়া নব গুঞ্জ দিয়া
উপরে ময়ূরের পাখা বামে হেলাইয়া
(আহা) গিরি চূড়ায় যেন মেঘ লেগেছে,
আজি প্রেম সুধা ধরবে বলে,
গিরি চূড়ায় যেন মেঘ লেগেছে—

"তখন সখিগণ বললেন, রাধারাণী ! যে রূপ তুমি দেখে এসেছ তা আমাদেরকেও যে একবার দেখাতে হবে।

"তাই শুনে রাধা বললেন, সখিরে, আমি আরো সে রূপ দেখে এসেছি সেই রূপের কথাই তো তোদের বলছি—

কালিয়া বরণখানি চন্দনেতে মাখা
আমা হৈতে জাতি কুল আর
নাহি গেল রাখা।
আমার, জাতি কুল আর রইল না রে
আমি কেন রূপে নয়ন দিলাম—
আমার জাতি কুল আর রইল না…"

কীর্তন শুনে মজে গেলাম। কীর্তনের আসর থেকে বেরিয়ে শুনলাম হালা বাবা নামে এক মস্ত সাধক নাকি মেলায় এসেছেন।

হরিজন সম্প্রদায়ের এই সাধক যেখানে এসে ডেরা পেতেছেন সেইখানে ভক্তরা বেশ অনেকখানি জায়গা জুড়ে সামিয়ানা খাঁটিয়ে পতাকা উড়িয়ে জায়গাটাকে সর গরম করে রেখেছে। সামিয়ানার মধ্যেই এক পাশে মহোৎসব এবং এক পাশে বাউল গান হচ্ছিল। আমি হালাবাবাকে দেখবার জন্য এবং বাউল গান শোনবার জন্য সেখানে গেলাম। হালাবাবা সেইখানে আসরের মাঝখানে বসে ছিলেন গ্যাঁট হয়ে।

রোগা বেঁটে খেঁকুরে চেহারা হালাবাবার। মিশ মিশে কালো গায়ের রঙ। বয়স অনুমান করা খুবই কঠিন। খাঁটি ফক্কড় যা পয়লা নম্বরের ফিঁচেল বলতে যা বোঝায় ঠিক সেই রকম দেখতে। মাথায় জটা। চোখ দুটো কুত কুতে ও সাল। কাচের ওপর কাঁকর দিয়ে আঁচড় কাটলে যে রকম কির কিরে শব্দ হয় ঠিক

সেই রকম কণ্ঠস্বর। পরণে লাল চেলি। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। ধুনি জ্বলছে সামনে। একটা ত্রিশূল পোঁতা আছে পাশে। মাঝে মাঝে কির কিরে গলায় একে ওকে তাকে দু' একটা করে জ্ঞানের কথা বলছেন। দেখেই বুঝলাম চালু পুরিয়া একখানি। মনে মনে হাসি পেতে লাগল আমার। যাত্রা থিয়েটারে হাসাবার জন্য এই রকম দু' একজনকে সাজানো হয় দেখি। কিন্তু এ যেন একেবারে সেই আসল চীজটি। মুখ পোড়া গোছের একজন লোক হালাবাবাকে গাঁজার কল্‌কে এগিয়ে দিচ্ছে। হালাবাবা সেই কল্‌কেতে জোরসে টান দিয়ে হেঁচে কেসে অস্থির হয়ে 'লবনী! এ লবনী!' বলে চ্যালাকে ডাকছেন আর মাঝে মাঝে 'বহুৎ আচ্ছা' বলে চেঁচিয়ে উঠছেন। 'বহুৎ আচ্ছা' শব্দটি আসরে নৃত্যরত বাউলের উদ্দেশে। হালাবাবা খুসি হচ্ছেন দেখে বাউলেরও উৎসাহ বেড়ে গেল! বাউল ঠিক নয়। আউল। প্রাণ ফাটিয়ে মাটি কাঁপিয়ে আসরের শ্রোতাদের মাতিয়ে দিয়ে গেয়ে উঠল সে—

হৃদয় পিঞ্জিরায় পাখি
আল্লা রসুল বলো না
ঐ নাম তুমি বলো আমি শুনি
আমি বলি পাখি তুমি শোন না···।

হালাবাবা মুগ্ধ হয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন 'আচ্ছা ভাই। বহুৎ আচ্ছা'। সত্যই বহুৎ আচ্ছা। কিন্তু গানের সেই সুরের মাঝখানে হালাবাবার অ-সুরের মতো গলা কানে যেন আলপিনের মতো বিঁধতে লাগল।

আউলের পর বাউল, পায়েরের শম্ভুদাস গাইল—

এ যে এক রসিক পাগল বাধলো গোল
নদের মাঝে দেখ সে তোরা,
পাগলের সঙ্গে যাবো পাগল হবো
আহা, হেরবো নব রসের গোরা।
নিতাই পাগল গৌর পাগল
চৈতন্য পাগলের গোড়া,
অদ্বৈত পাগল হয়ে রসে ডুবে
প্রেম এনেছে জাহাজ পোরা।

ব্রহ্মা পাগল বিষ্ণু পাগল
আর এক পাগল দেয় না ধরা,
তারা তিন পাগলে যুক্তি করে
মক্কায় করলে নামাজ পড়া—

শম্ভুদাসের গানে মধু এবং নাচে চমক আছে। তাই দারুণ জমে উঠল গান। দেখতে দেখতে অনুষ্ঠান শেষ হ'ল। ভক্ত বাউল, ভক্ত আউল, গান শেষে হালাবাবার পায়ে লুটিয়ে পড়ল। লুটিয়ে পড়ল আরো অনেকে। সুরু হ'ল প্রণামের পালা। ঐ রকম বিদঘুটে চেহারার একজন ফিঁচেলের পায়ে আজকের দিনের সভ্য ভব্য মানুষেরা যে কি করে মাথা নোয়ায় তা ভেবে পেলাম না। যার চেহারা দেখলেই ভক্তি উড়ে যায় তাকে নিয়ে এত মাতামাতির কি-ই বা আছে ?

আমি চুপ চাপ দাঁড়িয়ে লোকগুলোর কাণ্ড দেখতে লাগলাম। আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে একজন বলল—যান, বাবাকে প্রণাম করে আসুন।

আমি লোকটির কথায় কোন উত্তর না দিয়ে তার দিকে এমন চোখে তাকালাম যে সে আর দ্বিতীয়বার আমাকে ঐ কথা বলতে সাহস করল না।

কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলাম জানি না। একসময় হালাবাবাই ডাকলেন—এই ! এদিকে আয়।

হালাবাবার সংস্পর্শে যাবার বিন্দুমাত্র প্রবৃত্তি আমার ছিল না যদিও তবুও তাঁর এই ডাকে আমি না গিয়ে পারলাম না। কাছে যেতেই হালাবাবা বললেন—বোস।

আমি বসলাম। হালাবাবা সামনের ধুনিতে হাত দুটো সেঁকে নিয়ে আর একবার ভক্তের দেওয়া গাঁজার কল্‌কেয় জোরসে একটা টান লাগিয়ে তেমনিই হেঁচে কেসে অস্থির হতে হতে বললেন—কি নাম তোর ?

নাম বললাম।

—কোথা থেকে আসছিস ?

—হাওড়া থেকে।

এর পর হালাবাবা আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ কুৎকুতে চোখে তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করলেন—তুই ভগবান বিশ্বাস করিস?

আমি হালাবাবাকে জ্বলিয়ে দেবো বলে বললাম—না।

হালাবাবা এবার সোজা হয়ে বসলেন। তারপর বললেন—অনেকদিন পৃথিবীতে এসেছি বাবা। অভিজ্ঞতা বড় কম নয়। কলকাতার পাশেই থাকিস। চৌরঙ্গীর মেলা ফেলে জয়দেবে এসেছিস কি ইয়ার্কি মারতে? তোর ঐ চোখ দুটোই যে বলে দিচ্ছে তুই কি চাইছিস।

আমায় তখন ফাজলামিতে পেয়েছে। তাই ইচ্ছে করেই হালা-বাবাকে রাগাবোই মন করে নির্বিকারভাবে বললাম—আমার চোখ দুটো যে মেলার ভিড়ে সুন্দরী মেয়েদের মুখ খুঁজে বেড়াচ্ছে বাবা।

হালাবাবা এবার লাফিয়ে উঠে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন—তবে তো তুই মেরেই দিয়েছিস। তুই তো শিগ্‌গিরই পাবি তাকে। সুন্দরের মধ্যেও তিনি আছেন। আর মেয়েদের মধ্যে মাতৃরূপেও তিনি বিরাজিতা। সব মেয়েকেই মাতৃরূপে ধ্যান কর। খুব তাড়াতাড়ি পাবি তাকে। যা তাঁবুর ভেতরে যা। পেসাদ খেয়ে আয়।

সত্যি বলতে কি হালাবাবার স্পর্শ পেয়ে আমার কি রকম যেন হয়ে গেল। মনে হ'ল যেন সাক্ষাৎ ভগবানের বুকে আশ্রয় পেয়েছি। একি অপূর্ব সুখ। এতক্ষণ আমি এই মানুষটির সঙ্গে ফাজলামি করছিলাম? আমার রীতিমতো অনুশোচনা হ'ল। যাই হোক, হালাবাবা আদেশ দেবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর একজন শিষ্য আমাকে ভেতরে নিয়ে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল। আমি তাঁর সঙ্গে ভেতরে গেলাম।

ভেতরে মানে অস্থায়ী তাঁবুর আশ্রমে।

ভেতরটা বেশ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন। চারপাশ ঘুরে ফিরে দেখলাম। শিষ্যটির মুখে হালাবাবার পরিচয় পেলাম। হালাবাবা নাকি মাঝে মাঝে কাঁপতে কাঁপতে সমাধিস্থ হন। তাই তাঁর নাম হালা কাঁপা বাবা। গুণও অনেক। মাঝে মধ্যে থেকে থেকে উনি হঠাৎ হঠাৎ উবেও যান। দীর্ঘদিন তাঁর কোন পাত্তা থাকে না। কখন যান, কোথায় যান, কবে ফেরেন টের পায় না কেউ। হালাবাবার বয়সেরও

নাকি গাছ পাথর নেই। সবাই সব সময় ওনাকে একই ভাবে দেখছে।

তাঁবু থেকে বেরোতেই হালাবাবা জিজ্ঞেস করলেন—কিরে, কিছু বলবি ?

—না।

—পেসাদ খেয়েছিস ?

—না।

হালাবাবা অমনি কির কিরে গলায় ডেকে উঠলেন—লবনী ! এ লবনী ! লবনী অর্থাৎ নবনী সঙ্গে সঙ্গে কলাপাতায় মুড়ে প্রসাদ নিয়ে এলো।

আমি সেই প্রসাদ খেলাম।

হালাবাবা বললেন—তোদের জীবন সুখের জীবন। কিন্তু আমি সব সুখ ছেড়ে জীবনের এতগুলো বছর এত কষ্ট করে কেন কাটালাম বলতে পারবি ?

—না।

—তুই কোথা থেকে এসেছিস কোথায় যাবি তা জানিস ?

—না।

হালাবাবা বললেন—তুই বড় ভালো রে। এখন যা। পারিস তো আবার আসিস। এখানে উঠেছিস কোথায় ?

বললাম—বিল্বমঙ্গল আশ্রমে প্রেমদাস সাধুবাবার আস্তানায়।

হালাবাবা সঙ্গে সঙ্গে দু' হাত কপালে ঠেকিয়ে প্রণাম করে বললেন—প্রেমদাস বাবাজীকে আমার পেন্নাম দিবি। বড় ভালো মানুষরে। ঐ বাবাজীই একদিন হাত ধরে এই মেলায় নিয়ে এসেছিলেন আমাকে। সেই থেকে এখানেই পড়ে আছি। অমন মানুষ হয় না।

আমি হালাবাবাকে হাত তুলে নমস্কার জানিয়ে চলে এলাম।

আসবার সময় হালাবাবা আবার বললেন—ফের আসবি কিন্তু। বুঝলি ?

আমি বললাম—আসব।

কিন্তু সময়াভাবে হালাবাবার কাছে পুনর্যাত্রা আমার হয়ে ওঠেনি। তবে ঐটুকু সময়ের মধ্যেই হালাবাবা আমার মনে এমনভাবে রেখাপাত করেছেন যে আজও মনে মনে তাঁকে আমি শ্রদ্ধা করি। সত্যিকারের সাধন ক্ষমতা না থাকলে ঐ রকম চেহারায় কেউ কখনো অমন অগণিত শিষ্য সেবকের মন জয় করতে পারেন ? মেলায় তাঁবুর ভেতরে হালাবাবার সঙ্গে বীরভূমের যে সব বড় বড় সাধকদের ছবি দেখেছি তাঁরা নিশ্চয়ই হালাবাবাকে হেলা ফেলার লোক বলে মনে করেন না। করলে তাঁর সংস্পর্শে আসতেন না কেউ। হালাবাবা জ্যোতির্ময় পুরুষ নন। তবুও কিছু একটা না থাকলে সময়ে অসময়ে বার বার তাঁর কথাই বা আমার মনে পড়ে কেন ? কেন পারি না আজও তাঁকে আমার মন থেকে মুছে ফেলতে ?

হালাবাবার কাছে থেকে বিদায় নিয়ে চলে এলাম। এক জায়গায় মালসা ভোগ বিলি হচ্ছিল। সেখানে মালসা ভোগ খেয়ে নদীর বালিতে গিয়ে সটান শুয়ে পড়লাম। বালিতে শুয়ে নিজের মনেই হিজি বিজি কাটলাম কত। আমার অঙ্গ ধুলায় ধূসর হয়ে উঠল। তা হোক। এ ধুলা অঙ্গে ধারণ করার মতো সৌভাগ্য আর কিসে আছে ? আমি শুয়ে শুয়ে কত কি চিন্তা করছি। এমন সময় কানে এলো—

গৌর রূপে নয়ন দিয়ে সখি একি যন্ত্রণা
বন পোড়ে তা সবাই দেখে
মন পোড়ে তা কেউ না দেখে
বনের আগুন জল দিলে নেভে
মনের আগুন নেভে না—

কে গাইছে এমন মধুর গান ? চেয়ে দেখি এক দীর্ঘ পুরুষ, চাপদাড়ি, মাথায় পাগড়ি, গেরুয়া আলখাল্লা পরে এদিকে আসছে। ওপার থেকে এপারে আসছে। হাতে একটা গাব-গুবা-গুব। মানে আনন্দলহরী। সেটা বগলে চেপে দক্ষিণ হস্তে তারে আঘাত করে গান গেয়ে আসছে। আমাকে তার দিকে তাকাতে দেখেই সে থামল। তাকে থামতে দেখে আমিও উঠে বসলাম। বললাম—তারপর বাবাজী ?

বাবাজী বলল—তারপর ?

বোবায় যেমন স্বপ্ন দেখে চেতন পেয়ে বসে কাঁদে
বোবার মনের তুঃখ রইল মনে
প্রকাশ করতে পারে না।
সাপে যারে দংশন করে ওঝা এনে বিষ ঝাড়ে
কাল সাপের বিষ ঝাড়লে নামে
মনের বিষ তো নামে না।

এই পর্যন্ত গেয়ে বাবাজী মধুর করে হাসলেন। হেসে বললেন—তা গোরা মাণিক আমার! একলাটি এমন ধুলায় শয্যা পেতেছ কেন বাবা ? ঠাণ্ডা লাগবে। এভাবে শুয়ো না। যাও ডাঙার মানুষ ডাঙায় যাও। বলে সে আবার গান গাইতে গাইতে হাঁটুজল পার হয়ে ডাঙায় উঠল।

আমিও উঠলাম! তারপর যতক্ষণ পর্যন্ত সে মানুষের ভিড়ে মিলিয়ে না গেল ততক্ষণ চেয়ে রইলাম তার দিকে।

ডাঙায় এসে আখড়ায় পাতা পেতে মহোৎসবে সেবা করলাম। মহোৎসবের সুস্বাদু অন্নব্যঞ্জনে পরিতৃপ্ত হয়ে বেলা পড়ার আগেই ফিরে এলাম আশ্রমে।

আশ্রমে ফিরে এসে দেখলাম সচ্চিদানন্দ মুখ গোঁজ করে বসে আছে। মেলায় গিয়ে নাকি একটা বইও বেচতে পারেনি সে।

সাধুবাবা বসে আছেন যুগল তমাল তরুর বেদীতে। সেখানে তাঁকে ঘিরে কয়েকজন যাত্রী অনবরত প্রশ্নবাণে জর্জরিত করছেন। যাত্রীরা এসেছেন জয়দেবের মেলায়। পাকা গিন্নি সব। ধান দিলে খই হয়ে যাবে এমন কথাবার্তা। সাধু সন্দর্শনে এসে ধর্ম কথা শোনবার জন্য এমন ছট ফট করছেন যে মনে হোচ্ছে তাঁদের মতো ভগবৎ ভক্ত তুনিয়ায় বুঝি আর কেউ নেই। সাধু তাঁদের বুঝিয়ে চলেছেন—প্রেম হ'ল তিন রকম মা। উত্তম, মধ্যম ও নিকৃষ্ট।

—উত্তম প্রেম কাকে বলে বাবা ?

—উত্তম প্রেম হ'ল 'আমি ভাল বাসব তোমায় তুমি না বাসিলে।' এই প্রেম জগতে তুর্লভ।

—আর মধ্যম প্রেম ?

—মধ্যম প্রেম হ'ল প্রেমের বিনিময়ে প্রেম। তুমি আমায় যেমন ভালবাস আমিও তোমায় তেমনি ভালবাসি। আর নিকৃষ্ট প্রেম, যা সচরাচর ঘটে থাকে।

—কি রকম তবু শুনি ?

—ইন্দ্রিয় সুখ সঞ্জাত যে প্রেম তাই হ'ল নিকৃষ্ট প্রেম। কাম থেকেই প্রেমের উৎপত্তি হলেও প্রেম অপেক্ষা কামের গৌরব হতে পারে না। পঙ্ক হতে পঙ্কজ জন্মলাভ করে। পঙ্কের স্থান অধোদেশ। কিন্তু পঙ্কজের গতি উর্দ্ধমুখি। পঙ্ক দুর্গন্ধময়। কিন্তু পঙ্কজ সৌরভান্বিত। তাই সে স্থান পায় ভগবৎ পাদ পদ্মে। কিন্তু পঙ্ক পঙ্কজের জনক হয়েও ভগবৎ পূজায় স্থান পায় না। তেমনি কাম থেকেই প্রেমের উৎপত্তি হলেও প্রেমই ভগবৎ সেবায় লেগে থাকে। কাম নয়। কাম বা কু-ভাব মানুষের মজ্জাগত। স্বাভাবিক। কাম থেকেই দেহের উৎপত্তি। কামভাব দেহের ধর্ম। তাই মনের মধ্যে কাম এলেই তাতে দোষ বা পাপ হয় না। সেই ভাবকে কাজে পরিণত করবার চেষ্টা করলে বা সেই চিন্তাতে সুখানুভব করলেই দোষ। কু—ভাব আসে আসুক। তাকে স্থান দিও না। অন্য কাজে নিযুক্ত হও। মনকে অন্যত্র নিবিষ্ট করো। সদ্‌গ্রন্থ পাঠ করো।

সন্ধ্যে হয়ে আসছে দেখে আমি সাধুবাবাকে আরতির কথা মনে করিয়ে দিলাম।

যারা এতক্ষণ ধর্মকথা শোনবার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েছিলেন তাঁরাও ফিরে যাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়লেন। সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। এতখানি পথ ভেঙে যেতে যেতেই তো রাত্রি হয়ে যাবে। কি সর্বনাশ!' কারো কি একবারও খেয়াল হয়নি। বাবার পায়ে প্রণামি দিয়ে পড়ি কি মরি করে যেতে লাগলেন তাঁরা। তাঁদের রকম দেখে না হেসে পারলাম না।

সচ্চিদানন্দ, রোহিণী আর গেনিকে বললাম তৈরি হয়ে নিতে। আরতির দেরি হয়ে যাবে নাহলে। ন্যাড়া তো আমার বলার আগেই তোড় জোড় লাগিয়েছে। পট্ট বস্ত্র পরিধান করে তিলক কাটতে বসেছে। ওর ন্যাড়া মাথায় কে যেন সিঁদুর মাখিয়ে দিয়েছে একগাদা।

—কে মাখিয়েছে ?

কুন্তলা ফিক ফিক করে হাসতে হাসতে বলল—আমি। দোলের আবির ছিল। ঘষে দিয়েছি মাথায়।

ন্যাড়া বলল—থামো না। এবার তুমার মাথাতেও সিঁদুর দেবার ব্যবস্থা করছি। বর তো জোগাড় হয়ে গেছে। এখন বিয়েটা হল্যেই হয়।

—ধ্যেৎ। বলে লজ্জা পেয়ে কুন্তলা পালিয়ে গেল।

উঠোনে জলের তর তরা দিয়ে গেনি আবৃত্তি করতে লাগলেন—অষ্টত্তর শতনাম যে করে কথন, অনায়াসে যায় সে রাধাকৃষ্ণের শরণ।

রাধাকৃষ্ণের মহিমায় রাত্রি প্রভাত হ'ল।

গতকাল সচ্চিদানন্দ একটা বইও বেচতে পারেনি বলে আমি তাকে টেক্কা দিয়ে বলেছিলাম কাল আমাকে নিয়ে যেও দেখবে কত বই বেচে দেবো তোমার।

তাই আজ সকালে ওর সঙ্গে যাবার জন্য তোড়জোড় করতে লাগলাম।

কিন্তু সচ্চিদানন্দের রঙ ঢঙ শেষ হতে হতেই ঘণ্টা কাবার হয়ে গেল। ছিটে ফোঁটা তেলক কেটে সে যখন 'জয় নেতাই' বলে উঠে দাঁড়াল তখন তার দিকে চেয়ে মনে মনে মজা পেলাম বেশ। ইতিপূর্বেই আমার জলযোগ সারা হয়ে গিয়েছিল। এবার সচ্চিদার পালা। তবে সেবার ব্যাপারে বাবাজী একটু তড়িৎকর্মা বলে এ ব্যাপারটা সহজেই অল্প সময়ের মধ্যে শেষ হয়ে গেল। সেবা শেষ হলে আমাদের যাবার পালা। সফল কতটা হবো তা জানি না। তবে চেষ্টার কোন ত্রুটি রাখব না।

বইয়ের গাঁটরি। লাল শালুর পোষ্টার। এবং স্নান করবার জন্য তেল গামছা ইত্যাদি নিয়ে দুজনে বেরিয়ে পড়লাম। বসবার জন্য একটা বেঞ্চিও নেয়া হ'ল। এ ফ্যাচাংটা বাধালে ন্যাড়া। বললে, বেঞ্চি নাহলে এগুলো রাখবে কিসে ? আর তোমরাই বা বসবে কিসে ?

কথাটা সত্যি। সচ্চিদানন্দ বলল—জয় নেতাই। ভালো কথাটা মনে পড়িয়ে দিয়েছ বটে।

আমি অবশ্য একবার আপত্তি তুলেছিলাম। কুন্তলাও তুলেছিল। এই এতখানি রাস্তা ওটাকে ঘাড়ে করে নিয়ে যাওয়া সহজ নাকি? সচ্চিদার হ'ল এঁড়ে গরুর গোঁ। একবার যে ভূত মাথায় চাপবে তার, সে আর সহজে নামবে না। বলল—নে যাবার ভাবনা কাউকে ভাবতে হবে না। আমিই নে যাবো'খন। তুমি শুধু বইগুলা নেবে।

বইগুলোর কথা শুনেই তো চোখ কপালে উঠে গেল আমার। সর্বনাশ। এই এত বই মাথায় নিয়ে অত পথ যেতে হলেই তো গেছি। একে তো কাল সাধুবাবার তক্তাপোষ বয়ে গা গতর ব্যথা হয়ে গেছে। তার ওপর যদি এগুলো বইতে হয়—। কি ঝকমারি করেই যে বই বেচতে যাবো বলেছিলাম। যাই হোক। কুন্তলার সামনে বীরত্বে হেয় হতে আমার পৌরুষে বাধল। তাই ওগুলো যেন কিছুই নয় এমন ভান করে অক্লেশে ঘাড়ে চাপিয়ে নিলাম। সচ্চিদানন্দও বেঞ্চিটা মাথায় নিয়ে হন হন করে চলল।

আশ্রমের বাইরে প্রতিদিনের মতো আজও সেই বৃদ্ধ খঞ্জনি বাজিয়ে গান গাইছিল। গান শুনতে শুনতে সকালের সোনার আলোয় রাগারুণ হয়ে আমরা পথ চলতে লাগলাম। সচ্চিদানন্দ রসিক লোক। বলল—নদীর ধারে ধারে যাবা? দৃশ্য দেখতি দেখতি?

বললাম—তা যাব না কেন! তবে এই মোট মাথায় নিয়ে অত ঘুরে ঘুরে পথ চললে গা গতর ব্যথা হয়ে যাবে যে।

—হোক না। হতি দাও। গায়ের ব্যথা মরে যাবে। কিন্তু মনের এই আনন্দ। এই আনন্দটা চিরকাল রয়ে যাবে মনে।

কথাটা অবশ্য খাঁটি। একেবারে নির্ভেজাল খাঁটি কথা যাকে বলে এ হ'ল ঠিক তাই। মনের আনন্দ মরবে না। কিন্তু এই বোঝার আপদটা যদি না কাঁধে থাকত। মনে মনে একটা ফন্দি আঁটলাম। এঁটে সচ্চিদানন্দকে বললাম—তা বাবাজী! তোমার শরীরে তো দেখছি শক্তি রয়েছে খুব। বলি খাওটা কি? এত জোর পেলে কোথায়? এমন মহিষাসুরের মতো? এই বই কটা বইতে আমার জান বেরিয়ে যাচ্ছে; আর তুমি ঐ অত বড় ভারি বেঞ্চিটাকে মাথায় নিয়ে কিনা হন হন করে হাঁটছ?

ওযুধটা ধরল। সচ্চিদা বলল—আরে ফুঃ। আমি তোমাকে শুদ্ধ মাথায় করে বইতে পারি। চেহারা এ রকম হলি কি হবে। এককালে শের ছিলাম আমি। কত দাঙ্গা হাঙ্গামা যে করেছি, রায়টের সময় কত লাশ ফেলেছি তার কি ঠিক আছে?

আমি গ্যাকা সেজে গেলাম—বলো কি! লাশ ফেলেছ?

—তবে কি! এখনো আমার ক্ষমতা যা আছে তাতে করে হাতে একটা অস্ত্র পেলি পর একা একটা বাঘের সঙ্গেও লড়ে যেতে পারি।

—তা তুমি পারো। এখনি তোমাকে দেখলে বুক শুকিয়ে ওঠে (যদিও ওঠে না)।

সচ্চিদানন্দ হো হো করে হেসে উঠল। বলল—এখন তো কিছুই নাই রে ভাই। এখন তো আমার চেহারা একেবারে খারাপ হয়ে গেছে। আগে আমি রোজ কুস্তির আখড়ায় যেতুম। মুগুড় ভাঁজতুম।

—তা ভালো। তোমার সঙ্গে আলাপ হয়ে ভালোই হ'ল। কিন্তু তোমার দেহে এত শক্তি থাকতে এই লাইনে মরতে এলে কেন?

—সে অনেক দুঃখের কথারে ভাই। একবার শেয়ালদা ষ্টেশনে মুটেগিরি করতে গিয়ে—। সে কথা থাক। ওসব পূর্বাশ্রমের কথা বলতি নাই।

মনে মনে বললাম আমারও শোনবার ইচ্ছা নাই। যা শুনিয়েছ তাতেই আমার চক্ষুস্থির হয়ে গেছে। মুখে বললাম—শেষ পর্যন্ত মুটে গিরিও করেছ? জীবনে অনেক কষ্ট করেছ দেখছি?

—কষ্ট মানে? তিন মণ মালের বোঝা এই মাথায় করে বয়েছি আমি। শীতকালে ঘেমে নেয়ে গেছি।

—ওরে বাবা! আমার তো এই বইতেই দম বন্ধ হয়ে আসছে।

—আ দূর দূর। ও আবার একটা বোঝা! আমার কাছে ও কিছুই নয়। দাও তুমি ও-গুলান আমার ওপর চাপিয়ে। আমার কিচ্ছু হবে না।

আমি গ্যাকামো করে বললাম—না না। তাই কি পারি? বৈষ্ণবের কষ্ট দিয়ে পাপের ভাগী হবো শেষকালে?

—কষ্ট আবার কি! ওতে আমার কি হবে? কিচ্ছু হবে না। তাছাড়া এখন আর সাধু বৈষ্ণব নয়। এখন আমরা ভাই ভাই। দাও

তুমি ও-গুলান আমার মাথায় চাপিয়ে। আমার দৌড়টা আজ তোমায় দেখাই।

আমিও তাই চাইছিলাম। উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। সচ্চিদানন্দ বক বক করে পথ চলতে লাগল। তার অর্ধেক কথা কানে ঢুকল। অর্ধেক ঢুকল না।

মেলাতলায় রাধামাধবের মন্দিরের সামনে আমাদের দোকান বসল। সারি সারি দোকান। আসেপাশে। মন্দিরের গেটের সামনে আমরা বসলাম। লাল শালুর লেখাটা সর্বজনের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে টাঙিয়ে আমরা বই পত্তর সাজাতে লাগলাম। এখান দিয়ে যাত্রীরা মন্দিরে ঢুকবে। কাজেই বই বিক্রির এর চেয়ে উপযুক্ত স্থান আর কোথায় হতে পারে?

মন্দির প্রাঙ্গণে দারোগাবাবু বসেছিলেন। তাঁর কাছে অনুমতি নিয়ে আমি বই বেচতে আরম্ভ করে দিলাম। সচ্চিদানন্দকে বললাম—তুমি এক কোণে বসে বসে গৌর ঠক্ ঠক্ করো। আমি বিক্রি করি।

সচ্চিদা 'জয় নেতাই' বলে সরে বসল।

আমিও সুরু করলাম বিচিত্র সুরে হকারদের মতো—এই যে! মাত্র একটাকায় জয়দেব পদ্মা। জয়দেব পদ্মা আর বিল্বমঙ্গল। বিল্বমঙ্গল আর জয়দেব পদ্মা মাত্র এক টাকায়।

আমার ভদ্র চেহারাটা বলতে নেই অদ্ভুত কাজ করে গেল এখানে। আমার চেঁচানিতে এবং চেহারার গুণে ও বিচিত্র পোষাকের আকর্ষণে বেশ কিছু লোক জড় হয়ে গেল সেখানে। লোক জমতে দেখে আমারও মেজাজ চরমে উঠে গেল।

—মাত্র এক টাকায় বাজারের সেরা বই। এমন বই আর পাবেন না।

দু'একজন এগিয়ে এলো—দেখতে পারি একটু?

—নিশ্চয়ই। একশোবার দেখবেন। আপনাদের দেখাবার জন্যই তো আনা। কিনতেই যে হবে তার কি মানে আছে?

এইভাবে বেশ কয়েকটা বই বিক্রি হ'ল। কিন্তু তার সংখ্যা এত

কম যে তা বলা যায়না। ভাবলাম এই রকম করে গড়িয়ে গড়িয়েই যে কটা বিক্রি হয় হোক। দাম তো কমাবার উপায় নেই। তবে একটা উপায় আছে। সে উপায়টা হ'ল বুকনি। অমনি সুরু হ'ল, যে এসে দাঁড়াল তার কাছেই—একটা বই নিয়ে যান দাদা। সাধুবাবার লেখা বই। খাঁটি জিনিস। জয়দেব পদ্মা আর ঠাকুর বিল্বমঙ্গলের এমন জীবনি আর মিলবে না।

—কিন্তু দাদা! দাম যে বড্ড বেশি।

—তা অবশ্য বেশি। তবে কি জানেন, এটা তো ব্যবসার জন্যে বিক্রি নয়। বিল্বমঙ্গলধামে ঠাকুরের মন্দির তৈরী হবে। নবরত্ন মন্দির। তার জন্য চাই প্রচুর টাকা। কিন্তু অত টাকা কোথায় পাবো? কে দেবে? তাই চাঁদা নিলেই বিল দিতে হয় জানেন তো। সেই জন্যই এই ব্যবস্থা। বিলের বদলে বই। কত টাকা খরচা করে কত দূর থেকে আপনারা এসেছেন এখানে। একটা টাকা সাধুকে দিতে পারবেন না?

—কিছু কম করুন না?

—মাপ করবেন। কম হবে না। কম হবে না এই কারণে আপনাকে দু'আনা কমে দিলে আর একজন যিনি পুরো একটি টাকা দান করেছেন তাঁর প্রতি অবিচার করা হবে। কাজেই বুঝতে পারছেন, কম টমের ব্যাপার এখানে নেই। তাতে আপনার ইচ্ছে হয় নেবেন। না ইচ্ছে হয় নেবেন না।

ব্যস। আবার সুরু হ'ল বিক্রি। বেশ কখানা ঝটপট বিক্রি হয়ে গেল।

বেলাও বাড়তে লাগল ক্রমশ। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কত যে অভিজ্ঞতা হ'ল তা কি বলব। কত মানুষ এলো গেল। কত কেনা বেচা। কত হাসি আনন্দ। কত ঝগড়াঝাঁটি দু'চোখ মেলে দেখলাম। সচ্চিদানন্দকে একমন হয়ে জপ করতে দেখলাম। আমার পাশের দোকানদার ভদ্রতা করে আমাকে এক কাপ চা খাওয়ালেন। চা খেয়ে বই নিয়ে আবার বক বক করছি এমন সময় ঘোর কৃষ্ণবর্ণের একটি ছেলে এসে ডাকল আমাকে। গ্যাটা গোঁট্টা চেহারা। ছোট করে ছাঁটা চুল। বললে—আমাদের বাবু একবার আপনাকে ডাকছেন।

আমি অবাক হয়ে গেলাম খুব। বললাম—আমাকে!

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনাকেই ডাকছেন।

—কি নাম তোমার বাবুর? তাছাড়া আমি তো এখানকার কাউকে চিনি না। আমাকেও চেনে না কেউ।

—আপনি আসুন না আমার সঙ্গে।

আমার মনে কেমন যেন খটকা লাগল—কোথায় তোমার বাবু?

—তিনি গদীতে আছেন। আপনি আসুন।

—কি দরকার কিছু বলে দিয়েছেন?

—না। শুধু আপনাকে ডাকতে বলেছেন।

—আমাকেই যে ডাকছেন তা কি করে বুঝলে?

—হ্যাঁ। আপনাকেই ডাকছেন। আসুন না আপনি আমার সঙ্গে।

আমি যারপরনাই অবাক হয়ে গেলাম। সচ্চিদানন্দকে বললাম—আমাকে কে একজন ডাকছেন। আমি এক্ষুণি আসছি। তুমি বই গুলো পাহারা দাও। আর এই টাকা কটা রেখে দাও তোমার কাছে।

সচ্চিদা টাকাগুলো ট্যাকে গুঁজে বইয়ের বাণ্ডিলের কাছে সরে এসে বসল। আমি চললাম ছেলেটির পিছু পিছু। ভিড় ঠেলে যাচ্ছি তো যাচ্ছি। মনে সংশয়ও জাগছে খুব। কোন বদমায়েসের পাল্লায় পড়লাম না তো? তবুও সাহসে ভর করে এগিয়ে চললাম। অবশেষে একটি কম্বলের দোকানের সামনে থামল ছেলেটি।

ছেলেটি থামল। কাজেই আমিও থামলাম।

দোকানের মালিক শসব্যস্ত হয়ে উঠলেন আমাকে অভ্যর্থনা করবার জন্য। লোকটা বিহারি। পরণে খদ্দরের ধুতি, খদ্দরের পাঞ্জাবি। মায় মাথার টুপিটি পর্যন্ত খদ্দরের। আমাকে তিনি অভ্যর্থনা করে তাঁর গদীতে বসালেন।

লোকটাকে আমি মোটেই চিনতে পারলাম না। এমন কি কস্মিন-কালেও যে তাকে দেখেছি তা বলেও মনে হ'ল না।

—আমায় ডেকেছেন আপনি?

—হাঁ। জেরা বৈঠিয়ে।

আমি বসেছিলাম। আর একটু জাঁকিয়ে বসলাম। তিনি সেই

কালো মতো ছেলেটিকে অর্ডার দিলেন—দো কাপ চা ঔর চার কচৌরি লে আও। বলে একটা পাঁচ টাকার নোট তার হাতে দিলেন।

আমি বললাম—এই একটু আগে চা খেয়েছি। আর খাবো না।

ছেলেটি চলে যাচ্ছিল। তিনি হেঁকে বলে দিলেন—দোঠো ওমলেট ঔর দোঠো মেঠাই ভি লে আয়গা। সমঝা ?

দোকানে দু'একটি খদ্দের ছিল। আমাকে বসিয়ে রেখে তিনি তাদের সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। তারপর তাদের বিদায় দিয়ে বেশ করে জাঁকিয়ে বসে বললেন—খুব অবাক মালুম হোচ্ছে। না ?

আমি হেসে বললাম—তা হচ্ছে বৈকি। আপনাকে তো আমি চিনতেই পারছি না।

—কি কোরে চিনবেন। এর আগে তো আপনার সঙ্গে আমার মুলাকাতই হোয়নি। আমার নাম বিহারি। বাড়ি বিহার। গয়া জিলা। আপনার নাম ?

নাম বললাম।

—এই সাধুর সোঙ্গে আপনার কেতো দিনের পরিচয় ?

তাও বললাম।

—আপনাকে দেখেই আমার মালুম হোয়েছে। আপনি কি ওর ওখানেই আছেন ?

—হ্যাঁ। তাছাড়া আমার এখানে জানা চেনা কেই বা আছে যে তার কাছে থাকব ?

—সে তো ঠিক কোথা। কিন্তু সাধুর আশ্রমে একটা খুন হয়েছিল শুনেছেন ?

—হ্যাঁ।

—এ সাধুর উপর এখানকার কেউ লোক সন্তোষ নয় জানেন ?

—জানি।

—এ সাধুর ইতিহাস জানেন ?

—না।

—তাহলে বলি শুনুন।

এমন সময় খাবার এলো। খাবার খেতে খেতে সাধুর ইতিহাস শুনলাম। সাধু বাঙলাদেশের লোক নন। বিহারের লোক। প্রথম

জীবনে ইনি লেখাপড়া নিয়ে থাকতেন। বি. এ পাশ করেছেন। যৌবনে তিনি এক সুন্দরী জমিদার বধূর রূপে আকৃষ্ট হন। এবং তাকে নিয়ে গ্রাম ত্যাগ করেন। তারপর সেই জমিদার বধ্ এবং তিনি সাধু সন্ন্যাসীর ভেক নিয়ে এখানে এসে হাজির হন। কুন্তলা সেই জমিদার বধূর কন্যা। তারপর সাধু যখন গেনির রূপে আকৃষ্ট হন তখন মনের দুঃখে সেই জমিদার বধূ আত্মহত্যা করেন। গেনি আসলে ওর শিষ্যাও নয়। কিছুই নয়। দিনের বেলা গুরু শিষ্যা। রাত্রিবেলা স্বামী-স্ত্রী।

—আর ঐ যে মেয়ে কুন্তলা, ওকে দিয়ে সাধু ব্যবসা করায়। আপনার মতো অল্পবয়সি ছেলে দেখলেই তার সঙ্গে বিয়ে দেবার লোভ দেখায়। কুন্তলাকে দেখতে তো বড় যেমন তেমন নয়। কাজেই পোটে যায় সব। সেই তালে সাধুও কিছু হাতিয়ে নেয়। আপনি বললে হয়তো বিশোয়াস করবেন না বাবু, আমার সঙ্গেও কুন্তলার বিয়ে হোবার কোথা ছিল। কুন্তলা একরাত আমায় সোঙ্গে··· ।

—থাক। আর কিছু আমি শুনতে চাই না।

—আপনার সোঙ্গে বিয়ে দেবার কোথা কিছু বলেননি সাধুবাবা?

—না। ও সব কোন কথা হয়নি আমার সঙ্গে।

—আপনার কাছে তোবে আমার একটা অনুরোধ বাবু। আপনি পরদেশী লোক। কুছু জানেন না। আপনি ভালো মানুষ। আপনাকে দেখলেই তা মালুম হোয়। আপনি বামুনের ছেলে। কি চাকরি কোরেন বাপু?

—বেকার। ঘুরে বেড়াই।

—ও। ঠিক আছে। লেকিন আপনার কাছে আমার একটা অনুরোধ। আপনি কুন্তলাকে বিয়ে করুন। সব কোথা তো আপনাকে বাতিয়েছি। এখন আপনি একবার যদি রাজি হোন তো আজই আমার লোকজন গিয়ে টেনে নিয়ে আসবে কুন্তলাকে। আমরা সবাই মিলে গ্রামশুদ্ধ লোকে দাঁড়িয়ে এই রাধামাধবজীর মন্দিরে আপনাদের বিয়ে দিয়ে দেবো। বাবু, আমি কুন্তালাকে বহৎ পেয়ার করি। তাই ওর ভালোর জন্য বলছি ওকে আপনি এই পাপের হাত থেকে বাঁচান। সব কোথা আপনাকে বললাম তার মানে এই যে, যদি আপনি ওকে

বিয়ে করেন, তারপরে সব শুনলে যদি আপনি অসন্তোষ হন তাই সব কুছু আপনাকে আগেই বাতিয়ে দিলাম। এখন বলুন কি কোরতে চান আপনি! আমার বয়স চল্লিশ পার হোয়ে গেছে। এ বয়সে আমি ওকে বিয়ে করলে ওর জীবনটা বরবাদ হয়ে যাবে।

আমি বললাম—এ বিষয়ে এখনি আমি কিছু বলতে পারব না আপনাকে। কাল জানাব।

—লেকিন বাবু, আজ আপনি আমার এখানে থাকবেন। ওখানে যাবেন না। ও জায়গা আপনার পক্ষে নিরাপদ না আছে।

বললাম—বিহারিবাবু! আমার জন্য আপনি চিন্তা করবেন না। আমার কোন বিপদ হবে না। কাল আমি আপনার সঙ্গে ঠিকই দেখা করব।

বলে চলে এলাম।

ক্লান্ত অবসন্ন মনে সন্ধ্যের আগেই ফিরে এলাম তপোবনে। মনটা কেমন খিঁচড়ে গেছে। আর একদণ্ডও থাকতে ইচ্ছে করছে না এখানে। যে কটা বই বেচেছিলাম সে কটার টাকা দিয়ে দিলাম সাধুবাবার হাতে। টাকা পেয়ে খুব খুশি হলেন সাধুবাবা। বললেন —জয় হোক। তুমি আমার অনেক উপকার করলে।

কুন্তলা আমার খাবার আয়োজন করতে লাগল। আমি হু' চোখ ভরে তাকে দেখতে লাগলাম। কি অপরূপ যে লাগছিল। তার দিকে চেয়ে মনেই হ'ল না বিহারির মতো একটা কুকুরের সঙ্গে এক রাত সে···। না না না। এ হতেই পারে না। এ-সব ঐ ব্যাটার কারসাজি। পাছে আমি কুন্তলাকে বিয়ে করি তাই সে আমার মন ভাঙিয়ে দেবার জন্য আমার কাছে ঐ সব বলেছে। এর পিছনে নিশ্চয়ই কোন চক্রান্ত রয়েছে ওর।

আমাকে অমন অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে কুন্তলা অবাক হয়ে গেল বুঝি। তাই আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বলল—কি ? অমন হাঁ করে চেয়ে আছেন কেন ? ঘরের কথা ভাবছেন, না মনে মনে কোন মতলব আঁটছেন ?

—সে সব কিছুই নয়। তোমার সঙ্গে একটু কথা আছে। ওদিকে যাবে একবার ?

চারপাশ একবার বেশ ভালোভাবে দেখে নিয়ে কুন্তলা বলল— এখুনি ?

—না। সময় মতো।

কেমন যেন মিইয়ে গেল কুন্তলা। বলল—আরতির পর দেখা করব।

—বেশ। তোমার সময় হলে আমাকে ডেকো। বলে আর এক মুহূর্ত সেখানে না দাঁড়িয়ে চলে এলাম সেখান থেকে।

বনবাসী সাধুর কন্যা, তার মধ্যেও কলঙ্ক! অবশ্য এসব সত্যি নাও হতে পারে। কিন্তু যদি সত্যি হয়? এই পৃথিবীতে অসম্ভব কি? আমি উদাস দৃষ্টিতে দূরের দিকে তাকালাম। তাকাতেই নজরে পড়ল পিঁপড়ের সারির মতো সারি সারি কারা যেন আসছে। লোটা কম্বল চিমটে। সন্ন্যাসীর দল। জয়দেবের মেলা ভেঙে বিল্বমঙ্গলে আসছে তারা। মুখে তারা ধ্বনি ছাড়ছে। দেখতে দেখতে একেবারে কাছে এসে গেল। আমাকে দেখে আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল তাদের মুখ।

—এই তো। এই তো সেই বাবা ঠাকুর। মেলায় বই বেচতে গিয়ে আমাদের নিমন্ত্রণ করে এসেছিলেন।

—হ্যাঁ। আসুন আপনারা।

আশ্রয়ের স্থান তাদের দেখাতে হ'ল না। নিজেরাই খুঁজে নিল। বিশাল বটবৃক্ষের বেদীতে গোলাকার হয়ে বসে লোটা কম্বল বিছিয়ে ত্রিশূল পুঁতে জায়গাটাকে জম জমাট করে দিল সব। কয়েক জন আসপাশ থেকে মোটা মোটা কাঠ এনে ধুনি জ্বালতে বসে গেল। এই শীতে ধুনির আগুন না হলে মরে যাবে যে সব। আমি সাধুদের চা খাওয়াবার আশা দিয়ে গেনির কাছে গিয়ে বললাম চায়ের ব্যবস্থা করবার জন্য।

কুন্তলা বলল—আগে আপনি কিছু মুখে দিন তো, তারপর সাধুদের চা খাইয়ে আপ্যায়িত করবেন।

রোহিণী মা বললেন—সাধু সেবা তো করবে, কাল মহোৎসব, আর আজ যে সবাই জুড়ে বসল। বলি, সারারাত কি না খেয়ে থাকবে সব?

আমি বললাম—সে ব্যবস্থা করছি।

সচ্চিদানন্দকে বললাম ন্যাড়ার সাহায্য নিয়ে গোটা তিনেক উনুন তৈরি করে ফেলতে। বলে মুখ হাত ধুয়ে জলযোগ সেরে আমি সাধুদের আড্ডায় গেলাম। ভাগ্য সুপ্রসন্ন। সে রাতে তারা কেউ সেবা করতে রাজী হ'ল না। জয়দেবের মেলায় তারা এই অবেলায় শেষ

খাওয়া যা খেয়ে এসেছে তা তখনও পেটের ভেতরে গজ গজ করছে। তবে রাত করে কিছু মুড়ি পেলে মন্দ হবে না এই কথাটাই জানিয়ে দিল।

সন্ধ্যে উত্তীর্ণ হয়ে গেছে তখন।

বটতলায় সাধুদের আড্ডায় চিমটি লণ্ঠন আর ধুনির আঁচে এক চমৎকার পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে।

রামধনি চা নিয়ে এলো। সেই চা সাধুদের মধ্যে ভাগ করে দিলাম। শুধু সাধু সন্ন্যাসী নয়। বাউল-বৈরাগী বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীও ছিল কত। সকলকেই দিলাম। তারপর মনের সুখে বসে রইলাম তাদের দলে। তাদের আচার আচরণ কথাবার্তা উপভোগ করতে লাগলাম। কি বিচিত্র তারা। যেন উড়ো পাখির দল। ঘর ছাড়া। সংসার ছাড়া। ছন্ন ছাড়া। কোন বাঁধন নেই তাদের। স্বাধীন ভাবে চলাফেরায় নেইকো কোন মানা। যখন যেখানে মন চায় তখন সেখানে চলে যায়। ঘুরে ঘুরে বেড়ায় দেশের পর দেশ। ঘুরে বেড়ায় তীর্থে তীর্থে। মেলায় মেলায়। তারা ভিক্ষে ক'রে মানুষের শ্রদ্ধার অর্ঘ গ্রহণ ক'রে খুঁজে বেড়ায় ঈশ্বরকে। তাদের মন্ত্র হয়তো এক নয়, কর্মের পদ্ধতিও হয়তো এক নয়, কিন্তু তবুও তারা একই লক্ষ্যে পৌছতে চায়। তাদের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে আমার মনে হ'ল তারা কি সত্যই ঈশ্বরকে খোঁজে? না এ শুধুই ভেক? ভেক নিয়ে ভিক্ষে করা? শ্রেফ উদর পূর্তির প্রয়োজনে এই নিষ্কর্মার ব্যবসা? আবার মনে হ'ল তাই যদি হয় তাহলেও তো তারা সুখি। কেননা এ জীবন যখন একঘেয়ে হয়ে উঠবে, এই ঘুরে বেড়ানোতে যখন ঘেন্না ধরে যাবে, যখন জীবনের শেষ প্রান্তে পৌছে দেখবে সারাটা জীবন ধরে জীবনটার শুধু অপচয়ই করে এসেছি তখন কি বারেকের তরেও তাদের মনে অনুশোচনা হবে না? মনে পড়বে না সেই পরম করুণাময় ঈশ্বরের কথা? সেই প্রেমের সন্ধান কি তারা একটি দিনের জন্যও পাবে না যে প্রেমের পরশ পেলে পলে পলে ঈশ্বরের নাম বলতে বলতে দু' চোখ বেয়ে ধারা নামে?

আমি পাথরের মূর্তির মতো সাধুদের আড্ডায় বসে রইলাম। এই রকম সাধুসঙ্গ আমার জীবনে আর কখনো আসেনি। নদী তীরে এক

নির্জন তপোবনে লোকালয় থেকে বহুদূরে রাতের অন্ধকারে কম্বল মুড়ি দিয়ে গাছতলায় ধুনির আগুনে তেতে সাধুদের সঙ্গে বসে সময় কাটানো এই আমার প্রথম। বসে বসে তাদের ছন্নছাড়া ভবঘুরে জীবনের কথা ভাবছিলাম। এমন সময় ন্যাড়া এসে ডাকল—তোমার কি আক্কেল গ? আরতির সময় হয়ে গেছে। খেয়াল নাই? তুমি এসে এখানে বসে আছ? চলো।

চললাম। স্তব্ধ ছায়ামূর্তির মতো অনুসরণ করলাম তাকে। ঠাকুর বিল্বমঙ্গলের যুগল তমাল তরুর তলায় এলাম। ঝন ঝন করে খঞ্জনির শব্দ বাজল। তালে তাল দিলাম। শুরু হ'ল আরতির গান। ন্যাড়া সকলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে দু হাত তুলে ধেই ধেই করে নাচতে লাগল। বুঝলাম ভাব এসে গেছে তার। সে কি উদ্দাম নৃত্য। মানুষ ইচ্ছা করলে এ রকম নাচ নাচতে পারে না। এ নাচন নাচতে গেলে ভেতরে ভাব থাকা চাই। শুধু তেলক সেবা করলেই ভক্ত হওয়া যায় না। ভক্ত হতে গেলে ভক্তির সাধনা করতে হয়। ভক্তির সাধনা আবার সকলে পারে না। সে বড় কঠিন। যে পারে সে আপনা থেকেই পারে।

আমাদের গান শুনে স্তোত্র পাঠ শুনে সাধুদের আড্ডা থেকে কয়েক জন বাউল উঠে এলো। হাতে তাদের একতারা নেই, রয়েছে আনন্দলহরী। সেই আনন্দলহরী বাজিয়ে তারাও দুলে দুলে নাচতে লাগল। সাধুরা কেউ এলো না বটে তবে দূর থেকে (বটতলা থেকে) ধ্বনি ছাড়তে লাগল।

আরতির পর সবাই চলে গেলে কুন্তলা আর আমি সবার অলক্ষে রয়ে গেলাম। কুন্তলা বলল—তখন কি বলব বলেছিলেন?

প্রথমে আমি কোন কথা বলতে পারলাম না। একটুক্ষণ তার মুখের দিকে চেয়ে থেকে বললাম—বিহারিকে চেন তুমি?

চাঁদের আলোয় কুন্তলার মুখে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। বলল—শুধু আমি কেন, এখানকার সবাই চেনে তাকে। ওটা কুকুরেরও অধম।

—তোমার নামে সে দু' একটা আজে বাজে কথা আমাকে বলেছে।

—থাক। সে কথা আর উচ্চারণ করবেন না। আমি জানি সে কি বলেছে। শুধু আপনাকে নয় আরো অনেককেই বলেছে। কিন্তু আপনি বিশ্বাস করুন এ সব মিথ্যে। আমার বাবা এখানে আশ্রম করেছেন, অনেক জায়গা-জমি দখল করে বসেছেন সেই হিংসায় ওরা এই রকম করছে। তাছাড়া আমার ওপরও লোভ আছে ওর। কিন্তু ওর গলায় মালা আমি কখনই দেবো না। দিতে পারি না।

আমি হাসলাম। হেসে বললাম—থাক ও সব কথা। আর একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞেস করব। আমাকে তোমার পছন্দ হয়?

কুন্তলা এক পলক আমাকে দেখে নিয়েই চোখ নামাল। লজ্জায় কিছু বলতে পারল না সে।

—তোমার বাবা আমার সঙ্গে তোমার বিয়ে দিতে চান।

—আপনার কি মত?

—আগে বলো তোমার মতটা কি?

—আমি কি বলব? আমার মতের দাম কি বলুন? আমি গরীবের মেয়ে। আমাকে যিনি দয়া করবেন তাঁর ঘরই করতে হবে। তবে আপনাকে পেলে আমি সুখিই হবো। বলে আর না দাঁড়িয়ে চলে গেল কুন্তলা।

আমি অন্ধকারেই দাঁড়িয়ে রইলাম। সাধুকে আমার মতামত জানানো হয় নি। কি জানাব তাই ভাবতে লাগলাম। কুন্তলার মতো সুন্দরী মেয়েকে হাত ছাড়া করতে সত্যিই মন চাইছিল না। অথচ উপায়ও নেই। আমার অক্ষমতাই তার একমাত্র কারণ। মনে মনে ঈশ্বরকে বললাম, তুমি ছাড়া আর কাউকেই তো জানি না আমি, তাহলে আমার সঙ্গে এ ছলনা কেন? আমাকে তুমি মহত্তর জীবনের সন্ধান দাও। আমাকে লোকত্তর পৌরুষের সন্ধান দাও। আমি মৃত্যুর মাঝে অমৃতের সুধা নিয়ে যাতে তোমার কাছে পৌঁছতে পারি সেই শক্তি দাও ঠাকুর।

খুব ভোরে ঘুম ভাঙল। সচ্চিদানন্দ রাই জাগানো গান ধরেছে। ঘুম ভাঙতেই উঠে বসলাম। অমনি কন কনে শীতে কন কনিয়ে উঠল সর্বাঙ্গ। আজ এখানে মহোৎসব। গেনি, কুন্তলা, রামধনি, রোহিণী মা সবাই উঠে পড়েছে তখন। চারিদিক নিকিয়ে মুছিয়ে তক তকে করে ফেলেছে। আমি উঠেই চায়ের তাড়া দিলাম।

কুন্তলা বসে পড়ল চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে।

আমি দন্ত মার্জনা করে এসে বসলাম। ন্যাড়াও এলো। সচ্চিদা গেল স্নান করতে। রামধনি এক আঁটি খড় নিয়ে এলো কোথা থেকে। সেই খড় জ্বেলে আমরা আগুনের তাত নিতে লাগলাম। ওদিকে কে এক বৈরাগী তখন গান ধরেছে—

অনুরাগ না হলে হবে না গৌর সাধনা
সে যে অনুরাগী সর্বত্যাগীরে
সে জন মানে না কারো মানা—

গান শুনে সাধুও এসে বসলেন। ততক্ষণে আমাদের চা তৈরী হয়ে গেল। গেনি মুড়ি নিয়ে এলেন ঘর থেকে। চা আর মুড়ি। বটতলার এক বাবাজী এসে বললেন—আমাদের চা সেবা হবে না ঠাকুর?

বললাম—হবে না কেন! তবে চিনি তো নেই, ভেলি গুড়ের চা। রাজি থাকো তো বলো।

—রাধাগোবিন্দ! ভেলিগুড়ের চা? না বাবা। থাক তবে। আমরা গান বাজনা নিয়ে থাকি। গলা ভেঙে যাবে। আর চেঁচাতে পারব না।

চা খাওয়া হ'ল।

ন্যাড়া আর সচ্চিদানন্দ গেল জয়দেবে। সাধুসেবার পাতা আনা হয়নি। ওদিকে সাধুরাও এখানকার ব্যবস্থা দেখে উঠি উঠি করছেন। বললেন, আমাদের কাজ আছে গো বাবারা। আপনাদের এখনো উনুন ধরল না। রোদ উঠে গেল। আমরা তবে চলি। নাহলে সন্ধ্যের আগে পৌঁছতে পারব না যাব সব বক্রেশ্বর।

সাধুবাবা বললেন—না না, সে কি! সে চলবে না। এক্ষুনি ব্যবস্থা করছি। সব ঠিক হয়ে যাবে। আপনারা চলে গেলে অকল্যাণ হবে আমাদের।

সব তো ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু কি করে যাবে? আসল মালের তো পাত্তা নেই। যে রাঁধবে সেই রাঁধুনি বামুনই এসে পৌঁছুল না এখনো। সর্বনাশ! কি হবে তাহলে! এদিকে আসপাশের গ্রামগুলো থেকে ধামা ভর্তি চাল, বস্তা ভর্তি কাঁচা আনাজ—আলু, কপি, টমেটো, শাক ইত্যাদি মণ মণ আসতে স্বুরু করেছে। বেলা আটটা বেজে গেল। এত লোকের রান্না রাঁধবে কে? একি চাট্টিখানি কথা?

কয়েকজন সাধু আমাকে বললেন—বাবা! মিছি মিছি আপনি আমাদের হায়রান হতে আনলেন?

আমি বললাম—কি করে জানব বলুন, এ রকম হবে। যাই হোক কিছু ভাবনা নেই। সব ঠিক হয়ে যাবে। বলেই গামছাটা কোমরে জড়িয়ে রামধনিকে বললাম—নাও হাত লাগাও। আমরাই কাজ সারব।

সাধু বললেন—ক্ষেপে গেলে নাকি?

—ক্ষেপব কেন? দেখুন না কি করি।

এক জায়গায় চ্যালা কাঠের গাদা জড় করা ছিল। সেই কাঠ আমি আর রামধনি বয়ে নিয়ে এলাম। তারপর কাঠ ধরিয়ে বড় বড় কড়ায় জল দিয়ে বসিয়ে দিলাম উনুনে। সবাই অবাক। কয়েকজন সন্ন্যাসীনিকে ধরে নিয়ে এসে কুটনো কুটতে বসিয়ে দিলাম। গেনিকে বললাম চাল দিতে। সেই চাল ধুয়ে ধুয়ে কড়ায় তুললাম। ওদিকে তখন নতুন সাধু সন্ন্যাসীর দল পিল পিল করে আসতে স্বুরু করেছে।

বটতলা তমালতলা সব ভরে উঠল দেখতে দেখতে। আরো একটা উনুন ধরালম। ভবঘুরে সাধুগুলো আমার কাণ্ড দেখতে লাগল ভিড় করে। আমিও ঝোপ বুঝে কোপ বসালাম। বললাম আমার এখানে সেবা না করে কেউ যেন না যায়। রইল আমার মাথার দিব্যি। অতএব নট নড়ন চড়ন। সবাই বলল—জয় হোক বাবা। তুমিই ভাগ্য করেছিলে। নিজে হাতে রেঁধে সাধুসেবা করাবে। বহু পুণ্যফলে তবে আজ তুমি এ সৌভাগ্যের অধিকারি হয়েছ।

পুণ্যফল জানি না। কাজে লাগলাম।

ভাতের পর ভাত ফুটল। মোট চৌষট্টি কিলো চালের ভাত রান্না করলাম। তারপর উনুন থেকে কড়া নামিয়ে সেই কড়া দশ হাত অন্তরে রামধনির সাহায্যে বয়ে নিয়ে ঝুড়িতে করে ফ্যান ঝরিয়ে ঘরের কোণে গাদা করলাম। তারপর তরকারির কড়া মুছে তাইতে সামান্য পরিমাণ তেল দিয়ে বসিয়ে দিলাম উনুনে। ছাড়ানো আলু অল্প করে ভেজে কোটা বাঁধা কপি ঝুড়ি ভর্তি ঢেলে দিলাম কড়ায়। এইভাবে কপির তরকারি, শাকের ঘঁ্যাট, ডাল, চাটনি একে একে সব বানালাম। যেন কত কালের পাকা রাঁধুনি আমি। আমি যে কি করে এ সব করলাম তা আমি ভাবতেও পারলাম না! কোন এক অদৃশ্য শক্তি যেন আমাকে দিয়ে করিয়ে নিল সব কিছু। বেলা একটার মধ্যে সব শেষ। এবার খেতে বসার পালা। আমি হাত জোড় করে সকলকে বললাম—বাবারা এবার সেবায় বসুন। আপনাদের আশীর্বাদে আমি সব কিছুই করে ফেলেছি। দয়া করে বসে বসে খাবেন সব। চেয়ে চিন্তে নেবেন। আমাদের এখানে পরিবেশন করবার লোকও খুব কম।

বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে আমি সাধুদের কাছে অভিনন্দিত হলাম। তারপরে পাতা পড়ল। আমি অন্নের ঝুড়ি মাথায় নিয়ে পরিবেশনে নামলাম! দু' একজন বলল—বাবা আমাদের কাঙালক্ষ্যাপা ছিলেন নাকি গো?

—না গো না। এ বাবা অন্য ক্ষ্যাপা। সে ক্ষ্যাপা তো রাঁধা অন্ন পরিবেশন করতেন। এ ক্ষ্যাপা নিজেই রেঁধে সেই অন্ন নিজে হাতে পরিবেশন করছেন।

—বড় ভাগ্যবান গো ইনি।

শুনতে ভালোই লাগল।

সবার পাতে অন্ন পড়লে ধ্বনি দেবার পালা। এ হ'ল সাধু-ভোজনের নিয়ম। কে দেবে ধ্বনি? সচ্চিদানন্দ পাকা লোক। এগিয়ে এলো সে—সাধু সাবধান।

অমনি ধ্বনি উঠল—আ-আ-আ-ন।

—ফের করি সাবধান।

—আ-আ-ন।

—কুঞ্জে কুঞ্জে পদে শ্রীরাধা-রাধা-নাম।

—আ-আ-ন।

এর পরে সাধুরা আর ধ্বনি দিল না।

সচ্চিদানন্দ স্থর করে গাইতে লাগল—

গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলক শরীর।
হরি হরি বলিতে নয়নে বহে নীর॥
আর কবে নেতাই চাঁদ করুণা করিবে।
সংসার বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে॥
বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন।
কবে হম হেরিব সে মধু বৃন্দাবন॥
রূপ রঘুনাথ পদে হইবে আকুতি।
কবে হম বুঝিব সেই যুগল পীরিতি॥
রূপ রঘুনাথ পদে রহুঁ মম আশ।
প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তম দাস॥

ব্যস। সব শেষ। এবার ভোজনের পালা। অন্ন ব্যঞ্জন মুখে দিয়ে সকলে ধন্য ধন্য করতে লাগল। গর্বে ভরে উঠল আমার বুক। সবই ঠাকুরের কৃপা। সাধুরা বললেন, বাবাজী আমাদের শাকের তরকারি আর চাটনিটা আচ্ছা বানিয়েছেন বটে।

ন্যাড়া, আমি, সচ্চিদা সবাই মিলে পরিবেশন করলাম। সবার খাওয়া শেষ হলে বসলাম আমরা। সাধু বললেন—এ যাত্রা তুমিই মুখ রক্ষা করেছ আমার। কি আর বলব তোমায়। জয় হোক।

হোক জয়।

সন্ধ্যের সময় আবার সব ফাঁকা হয়ে গেল। যাবার আগে সবাই দেখা করে গেল আমার সঙ্গে। বলল—চলি গো বাবা, আবার দেখা হবে। কেউ বলল, কঙ্কালিতলার মেলায় যাওয়া চাই কিন্তু। কেউ বলল, ফুল্লরার মেলায় দেখা পাবো তো ?

সকলকে বিদায় দিয়ে বিষণ্ন মনে একা আমি শূন্য বটতলায় দাঁড়িয়ে রইলাম। এমন সময় কে যেন আমার কাঁধে হাত রাখল। মুখ ফিরিয়ে দেখলাম সাধুবাবা।

—এমন করে দাঁড়িয়ে যে। কি ভাবছ ?

—ভাবিনি কিছু। কাল আপনাদের ছেড়ে চলে যেতে হবে। তাই মনটা কি রকম করছে।

—কাল কি না গেলেই নয় ?

—যেতেই হবে কাল। না হলে বাড়িতে ভাববে।

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে সাধু বললেন—ও ব্যাপারে কিছু ঠিক করলে ?

—কোন ব্যাপারে ?

সাধু আমতা আমতা করতে লাগলেন।

বললাম—এখনো কিছু ঠিক করিনি। বাড়িতে একবার বলে দেখি। পরে চিঠি দিয়ে জানাব।

—বেশ। আর ঠাণ্ডায় দাঁড়িয়ে থেকো না, চলো। আরতির সময় হয়েছে।

আমি ছায়ার মতো অনুসরণ করলাম সাধুকে।

রাত তখন কত তা জানি না। ঘুমটা বেশ গাঢ় হয়ে এসেছে। এমন সময় কপালে কার নরম হাতের স্পর্শ পেলাম। আমার সজাগ ঘুম। সহজেই ভেঙে গেল তাই। দেখলাম অন্ধকারে দুটি উজ্জ্বল চোখ চেয়ে আছে আমার মুখের দিকে। সে চোখ কুন্তলার। কুন্তলা আমার হাতে মৃদু একটু টান দিয়ে ইশারায় ডাকল। আমিও মন্ত্র মুগ্ধর মতো তার পিছু পিছু চললাম। বাইরে তখন জ্যোছনার বান ডেকেছে।

কিছুটা দূরে গিয়ে কুন্তলা বলল—আপনি এখুনি, এই রাতেই চলে যান এখান থেকে।

আমি কিছুই বুঝতে না পেরে বললাম—কোথায় যাবো ?

—যেখান থেকে এসেছেন। আর এক মুহূর্ত এখানে থাকবেন না।

—কি ব্যাপার বলতো ?

—ব্যাপার যাই হোক। সে আপনার জানবার দরকার নেই। যদি বলেন তো রামধনিকে সঙ্গে দিতে পারি। আপনি চলে যান।

—কিন্তু ন্যাড়া ?

—তার ভাবনা আপনাকে ভাবতে হবে না। সে আপনার কে ? আমি জানি আমাকে গ্রহণ করতে আপনার অসুবিধা আছে। কিন্তু এদিকে ওরা ঠিক করেছে আজই শেষ রাতে আপনার সঙ্গে আমার বিয়ে দেবে।

—তার মানে ?

—ন্যাড়া বলেছে আপনার মা বাবার নাকি সেই রকমই ইচ্ছা। আপনি বিয়ে করতে চান না! তাই মনো মতো কাউকে পেলে ও যেন নিজ দায়িত্বে তাঁদের নির্দেশানুযায়ি সে কাজ করিয়ে আনে। বাবাকে এই কথাই বুঝিয়েছে সে। এখন ভেবে দেখুন কি করবেন ?

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম—আমি তো এসবের কিছুই জানি না।

—তাই বলছি আপনি চলে যান। এই পর্যন্ত বলার পর কুন্তলার চোখ দুটি ছল ছল করে উঠল। বলল—আমি গরীবের মেয়ে হতে পারি কিন্তু কারো অনাদর আমি সহ্য করতে পারব না। আমি জানি এই বিয়ের পরিণাম কি।

আমি স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলাম তার মুখের দিকে। তারপর আস্তে করে বললাম—আমার কম্বলটা যে রয়ে গেছে ওখানে।

—এনে দিচ্ছি। রামধনিকে ডাকব ?

—দরকার নেই। একলাই যেতে পারব আমি, তুমি শুধু কম্বলটা আমাকে এনে দাও।

কুন্তলা চটপট মেয়ে। কম্বলটা নিয়ে আসতে একটুও বিলম্ব করল না।

সেখানি আমি সারা গায়ে জড়িয়ে নিয়ে পথে নামলাম। কুন্তলাও

খানিকটা পথ এলো আমার সঙ্গে। আমাকে পথের নিশানা বলে দিল। বলল—সোজা বালি ভেঙে নদী ডিঙিয়ে ওপারে শাল সেগুনের বনের পাশে শ্যামরূপার গড় পাবেন। সেখানে রাতটা কাটিয়ে কাল সকালে চলে যাবেন শিবপুরে। ওখানে বর্ধমান আর দুর্গাপুরের মেলাই বাস পাবেন। আশা করি অসুবিধে হবে না। কেমন ?

আমি 'আচ্ছা' বলে থেমে দাঁড়িয়ে তার মুখখানি শেষবারের মতো বেশ ভালো করে দেখলাম কিছুক্ষণ। তারপর হাসি মুখে বিদায় নিয়ে পথ চলতে লাগলাম। দু' একবার ইচ্ছে হ'ল পিছু ফিরে দেখি সে এখনো পথের ধারে দাঁড়িয়ে আছে কিনা। কিন্তু ইচ্ছে হলেও দেখলাম না। আগের মতোই হন হনিয়ে পথ চলতে লাগলাম।

শেষ